সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠ গল্প

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শীতলচন্দ্র রায়

তারকেশ্বর প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শ্রীকানাই পাল

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই :

পঞ্চতন্ত্র

ময়ূরকণ্ঠী

অবিশ্বাস্য

জলে ডাঙায়

চতুরঙ্গ

দেশেবিদেশে

চাচাকাহিনী

শবনম্

দ্বন্দ্বমধুর

ভবঘুরে ও অন্যান্য

বহুবিচিত্র

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

ধূপছায়া

টুনিমেম পছন্দসই

পছন্দসই

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী

পরম শ্রদ্ধেয়া

শ্রীযুক্তা রাধারাণী মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

প্রকাশকের নিবেদন

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের গল্প শ্রেষ্ঠ না নিকৃষ্ট সে বিচারের ভার আমাদের উপর নয়, কিন্তু আশা করি কোনো পাঠকই অস্বীকার করবেন না যে, তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু অতি বিচিত্র ; নানা দেশ, নানা ধর্ম, নানা সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে তারই কিয়দংশ তিনি তাঁর ছোটগল্পে প্রতিবিম্বিত করেছেন।

এই সঞ্চয়ন প্রস্তুত করার সময় তাই আমরা সবসময় শ্রেষ্ঠত্বের দিকে দৃষ্টি না রেখে বৈচিত্র্যের দিকটাই দেখেছি বেশী।

নিবেদক

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ নোনাজল ॥

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুরগির খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নয়—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর-সবই বদলে গিয়েছে, বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কি রকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা, আর যে-গন্ধটি আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুরগি-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুরগি, তারই পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছনো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটী আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর চোখে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ' পত্রিকা। মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা হলেও তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নূতন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি

দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কি করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আরজি লিখতে গেলেই হিমশিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এত বড় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন। হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল! সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি-টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি।

একটুখানি গলা খাঁকরি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বললে, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখি নি কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথায়? বোস—না, তার ফুরসত নেই?'

ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এস। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ-পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোওকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যে রকম পুঁথিপড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কি ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।

আমি শুধালাম, 'কি হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

সারেঙ বললে—'শুনুন—

'যে-লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান-মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে-লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কি রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই, যার দু দিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ-বারো-চৌদ্দ হাজার টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেলে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে

টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলানো হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরেজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, আমাদের সক্কলেরই দু-একবার হয়েছে, আর-সবাই জাবড়ে ধরে জলে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখ্খনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন সায়েব? বাং মছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমে ছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, "এমখ" হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জান পানি হয়ে যে কুলুম শহর পৌঁছলাম—'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল

বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশী কামায় নি, তার হাতে পনেরো টাকা! সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

'আমরা পেট ভরে যা-খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাকসবজি। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইড্‌ন্‌' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।'

বুঝলুম 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই? সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে-খবরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কি ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফত নয়।

সারেঙ বললে, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরিকিন মুল্লুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকেই নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড়

কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরিকিন মুল্লুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরিকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।

'নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কি কৌশলে সে পাড়ে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সাহেব, কি রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরি করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেকচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেকচির ভিতরে তার সুট জুতা মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেকচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর্গ থেকে। পুলিসের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে গা-ঢাকা

দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোনও ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার স্যুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউক-বাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ্ খোঁজ্ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোঁসাই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না করেই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর, আমি পুরো সাত বছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে উঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা, হুজুর, দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!'

বসল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে যে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরিকিন মুল্লুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল

আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচের কামে। এ-জাহাজে আসার হু দিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা, ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, "ভাই সমীরুদ্দী!" এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না, প্যার করেছি।

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার কোনও প্যারে সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকল না?

'কোন কথা কয় না। ফকির দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিচ্ছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কি করে?

'সেদিন হুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—মুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কি ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে

রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তার সে দুঃখের কাহিনী ঠিক ঠিক বলি কি করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিঁধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব-কিছু সেরে দিয়েছিল।

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচ শো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্যে। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা, দেওয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙি-ঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বচ্ছর ধরে সমীরুদ্দী মিরিকিন মুল্লুকে অসুরের মত খেটে দু শিফ্‌ট আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজগার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচা করেছে, তা দিয়ে মিরিকিন মুল্লুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরিকিন মুল্লুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশনের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমীও বিনা তকলিফে। তার উপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানায় কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানখেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানখেতের মাঝখানে।

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুল্লুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

'কত দূর-দরাজ থেকে সে মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দী জানে।

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখি—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কি কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতেই পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই

সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী!'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কি সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিনি, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে, মিরিকিনি মুল্লুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ-দেশে আর ফিরবে না। আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা, তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানখেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলেনি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের

মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে সেদিন গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল্, ফের মিরিকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পর দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন মুখ নিয়ে ভায়ের কাছে এল সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কি করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে, সে বাড়ি ফিরে যাবে না।'

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি! তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, 'ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার সেই পুরনো দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, স্বপ্ন হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে? 'সমীরুদ্দী মিরিকিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে

তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়ের কাছে আবার সে টাকাটা ওড়াল।

ইনসাফ কোথায়?'

॥ পাদটীকা ॥

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনো গতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো স্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন

বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা,' 'পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু কে উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন! আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; 'দোলা-লাগা, পাখী জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য, 'শাখামৃগ', 'দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে! এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধ-রূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে, সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশী হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। তিন মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকতো—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করবার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি ?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে টানাপাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি, ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া টিকিতে দোলা লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত

ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চীপ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সাহেবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল্ অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কসুর বিনা-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্ক-নাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার। নিশ্চয়ই তার অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বললে, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেড-মাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানলা দিয়ে

দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের পণ্ডিত মশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদ বাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছে (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তি ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশ্চাচ, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই—ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুল আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাস খ্যাস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গবব-যন্ত্রণা,' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গবব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্তদেহটা ফিরে

পাওয়ার আনন্দে প্রাণভয়ে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে বেগ্‌নি রঙের আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তুণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন; সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয়, দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণে হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে, তবে 'রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জয়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত!

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের অতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু' তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?' বললুম 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারী না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেন নি'।

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই, জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে?'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ,—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ওতো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো?'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন'। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিস্বর উল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট্‌ দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদন-মোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিস্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, কি রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে কি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।'
পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন। আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান?'

আমি হতবাক্।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননায় কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল

নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

॥ বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ॥

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানলা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেতো না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাঁইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়'।

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দু'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহার রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁহাতটা পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদন করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা' টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিনা পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট হেগেলের দেশ। বললুম 'অ।'

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার রাইন-ওডার না এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়ত একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দিকাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর' লাতিন নাম জানিনে; 'হাতী' হল 'এলেফাণ্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশ পানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতি আর ঘণ্টা গালাগালি হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্র্যাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্‌স্‌ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে!

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদা সিদে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালীতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন

সেখানে সোনালি রোদে রূপালী প্রজাপতির কি রাগিণী। তারই মত তাঁর ব্লণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না? তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহনত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক ব্রিলেগেড্ রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন—আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি। আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনাদের দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো ঠিক করতে পারিনি, কি করে যে আমার তখন মনে হ'ল এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই বা না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান, না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে' আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এ-সব পাগলামি করছে কি করে!

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে; বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এতো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাবে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বং অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁবে ডেকে হবে—'

আমি বললুম 'কচু' হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো রয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করলেন। একি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য)—নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরিস্থান না ম্যুনিকের ফুট-পাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমি চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপসোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা বলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ তরুণী একরকম মুখগুমসো করে খানা-মরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা রী, নত্রদাম গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা মোমবাতি মানত রলুম। দয়া করো, মা একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো কিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে বং মুখোমুখি! দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো রাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর ড়ল। মেয়েটি ভুরু কুচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা ন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা ড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরীর অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দয়ে উঠে বসল, "দাঁড়ান আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।"

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে রলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না' 'আপনি কেন মিছে মিছে', ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস ব্যস' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইনল্যাণ্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা

থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে ?—মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই, বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

"জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।"

ডাক্তার বললেন, খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্‌টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর, জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি ?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকস শুকিয়ে গিয়েছে ? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টি-সেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তার পর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না ; ওহে খানসামা, এদিকে—, ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারী ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ্ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের ‌‌াসিস্টাণ্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি সছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক দ্র। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্ বাই' বলে হাত বাড়ালুম ন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের খা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে থ এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ স্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় ন্তার।

"আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ'?"

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা র স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর কার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই সবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে মার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে ঈমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা ত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয়। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে, বাপ-মা নেই! এক খাণ্ডার পিসির বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পড়তে দেয়, ব্যস্। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারী করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে, চকিতা হরিণীর মত সমস্তক্ষণ সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে কক্‌খনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজী হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম তোমার পিসির কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লাজ।'

যা-কিছু আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন-টিনের ভিতর মাছের মত। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।' আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী, কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।'

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?'

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা ষ্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস্, আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর। টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মত কাছে টেনে আনতে পারি।

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ওরকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই

হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত'।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে, হাঁ, আপনাদের নীচশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না'।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ কমা পর্যন্ত আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।'

আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তারপর বিদায়। যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ীর সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।"

ডাক্তার বললেন, বিশ্বাস হয় আপনার? যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজী হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম বুধবার দিন সন্ধের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে।

াবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ হয়ে চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশী সময় নেই। অথচ টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা ঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা-মরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম 'আমরা বাঙলায় বলি, 'দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম'।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার াড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নিচে—আপনাদের াগলা ফারন্‌হাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নিচে! রাস্তায় এক ফুট রফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো ার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে ঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো,হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার াজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার াত ধরলো,—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার পর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল!

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্লাটের রজা খুলে, করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে াড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, টুকটুকে লাল াট দুটি ব্লু ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনি-নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন, পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, 'দরজা খোল।'

'পিসি!

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

'আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মত বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি'।

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না, কেলেঙ্কারি,' 'শোবার ঘরে পরপুরুষ,' রাস্তার মেয়ের ব্যাভার,' এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ' গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম,

'আমার নাম পেটার সেল্বাথ্। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই'।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব

এতদিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হা করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক! সেটা দেখতে আরো বীভৎস! মুখের কুঁচকানো' এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বললে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনো অচৈতন্য।'

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে, এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ্ কট্‌লেট্ এল। হৈ হৈ রৈ রৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হ'ত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো'।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ, সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি

রোদে রূপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যাণ্ডের শ্যামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম !

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন

আমি মাথা নীচু করে করাসিস কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলি-প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

॥ মণি ॥

'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে উর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ নায়ক-নায়িকাকে সমান সম্মান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো উর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেন নি ? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল, এতৎসত্ত্বেও আদি-কবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেন নি, 'নির্ভেজাল' রূপকথাতে যে-রকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায়। হলই বা। তাই বলে কি শেষ-মেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না ?

জানিনে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কি উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্লবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকুল-কাঁচুলি কেচে দিত, তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন ? উর্মিলার মত নিদে-

তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কি উত্তর দিতেন ?

অত দূরে যাই কেন ? কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তম চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলায় সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দুজনকে পথমধ্যে গুমখুন করলেন কেন, তা হলে তিনি কি উত্তর দিতেন ?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের গুকুরুল্লা এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচে গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া আন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারি নি। মাধাই ও আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বচ্ছর ফেল মারত, আমি ফার্স্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, মোক্ষম মনঃস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎচরিত্রই জীবন্মৃত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয় নি, 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠির বাইরে বিয়ে-শাদি করেন নি। ইনি পেশাওয়ারের পুলিস ইনস্‌পেকট্‌র আহম্মদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র

পরিক্রমা করেও দেখতে পাই নি। আমার বিশ্বাস, পাঠান যে সরল প্রকৃতি ধরে সে কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইপ্পাইয়ের ফকীর ইংরেজীতে বলে ফকীর অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যাণ্ড জাইন্টস্, নো নর্মেল্স্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল্-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃণা' নয় —ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চাণক্য বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ। বোধ হয় প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহুদূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বান্ধব, দুনিয়াদারি-বাবদে-বেকুব বাঙালী। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিলেই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিই নি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসি নি। আমি লিখতে বসেছি, তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহৃদয় সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরাণী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব আলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই :—

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ-পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামিগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তাঁর অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমার এসব বলার কি দরকার? আমারই বা এসব জেনে কি হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেন নি?'

আবদুর রহমান বললে, তিনি কেন বলেন নি সে-কথা আমি কি করে জানব? (পরে মহবুব আলির কাছে শুনেছিলুম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

রাত্রে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলি খান বড় ভাল লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এ-কথা বলে রাখা ভাল।

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো যেত। তিনি দফ্তরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম, আর বাবুর্চীকে সবিস্তর বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু-ফার্সী-পাঞ্জাবী-পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর শেখ মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান,' তার সঙ্গে গল্প করে আমি যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি. সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় হ্যাণ্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল্। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশীন হলেন, তাঁর গৃহে তো মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গোট্টা গাট্টা গল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে গফুর মুহম্মদ খান। দেখে—হকচকিয়ে গেলুম—দেখি, দীর্ঘ এবং তম্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে শিলওয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত নেমে-আসা লম্বা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথায় আধেক ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশাওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ-মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশীন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে এবং আমি তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম সেও আধ লহমার তরে, গুরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তন্বঙ্গীর দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি; বরঞ্চ বলব তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনের-ষোল হয় কি-না হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান?

তা সে যাকগে। তখন কি আর তত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম।

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম; খানিক পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-অ-ণি—'

মণি দোরের আড়ালে দাঁড়ালে, দুজনাতে পশতু ভাষায় কথাবার্তা হল। আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনও বাবুর্চীই করে, কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না। মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করেছে। ভালই হল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটাও তৈরি করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসি। সেঁকো বিষ

দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকাল। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিংবা ওই ধরনের কিছু বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতুম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রই খুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম, 'পশতু,' তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম্ কায়দায় পদ্মফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম 'ডডনং' অর্থাৎ আমি পশতু বুঝি নে। কিন্তু কেবা শোনে কার কথা। ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরী লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুদে ও মুদ্রা দেখিয়ে শঙ্করদর্শনের আলোচনা চালাত একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মণিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায়, আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কতল করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা সেরে শুধালে, 'মণিকে আপনার কি রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার যে ভাবের

আদান-প্রদান রঙ্গ-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদানী' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা ততখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা-না-লাগার কি আছে?

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, এ আপনি কি বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবার, পাঠান-পখতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালবাসেন। আর আপনি যে-ভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয় নি। 'শাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারবে,' এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশাওয়ার-কোহাট, বন্ন-ডেরাইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর থেকে।—লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাসী-দফতরী কেরাণী-খাজাঞ্চী মণিকে শাদী করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কী রকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল! লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেও বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম, 'থাক-থাক্।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে

ছিলুম ; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে, মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করল।

মহবুব আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান।' ঘোড়া উঠে, নৌকা ঘোড়ায় ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ আমিও বিপদে পড়েছি। আবদুর রহমান বলছিল এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দরজীর দোকানে ভিড় লেগেছে। কি করি, বলুন তো ?'

ততক্ষণ খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলী চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন ? আমার বিবি বললেন, সে কি—'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ব্যস্ ব্যস্।'

মহবুব আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ-বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলেও বিয়ে শাদি করেন না। যদিও কুরান-হদিসের রায়, যে-কোন মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কি করে জানবে বলুন ? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কি করে বুঝবে বলুন ?

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক স্টর্ম-ইন-এ টি-পট! তিলকে তাল! আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায় তাতে আমার কি?'

মহবুব আলী শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কি?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণে এল। বললুম, 'না না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনও সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশই বা দিই কি প্রকারে?

কাবুলে এপিডেমিক সর্দিকাসি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্কেয়ার। ভেবেছিলুম কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হয়।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়িবাজি বিভন-বিশপ ফল্স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছিল নাকি?' মণি একবর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

মহবুব আলী এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, আরও কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কী বলব! সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে,

"বাদশা আমানউল্লা খান সৈয়দ সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এ-দেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক! তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সায়েব আর কী করেন! শাহানশাবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এ দিকে আসার ফুরসত তাঁর আর কই" ?'

আমি জীবনে ওই একবারই গীতা বর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ।

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চাৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তারপর শয্যা নিল, ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমি শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?'

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে-স্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবার মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। ন্যাকরাগলা, আবদেরে-আবদেরে সুরে বললেন, 'তাহলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি, এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসুরত বলে মনে করেন?'

আমি তো রেগে টঙ; চীৎকার করে বললুম, বলুন, 'বলুন, বিশ্ব-সুদ্ধকে বলুন আমার কি আপত্তি? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখামাত্রেই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন? চিৎকার

করে তখন কী বলেছে, শুনেছেন? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে "ওঁর হাতে মেহ্‌দীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেন নি"।'

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, 'মেহ্‌দীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিয়ে হয় না?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কত বার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে ও বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় পাঠান-জগতে। বিশ্বভুবনের খবর রাখে না।'

আমি শুধালুম, আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম, এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হটাৎ কেটে গেল কি প্রকারে? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিষটে আরও প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক-কান বুজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান-মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারি নি; তাই তার একটা সমাধান খুঁজছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

আমি আর কি বলব? অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। *বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন* আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষণ্ণ। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব

মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইলুম, 'ভালই হল,' কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পৌঁছত, কেউ বলত কাবুলে লুটতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাসী থেকে ও-চাপরাসীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হল।'

আমি কিছু বলি নি।

কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর একদিন খবর পেলুম, অ্যারোপেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে 'গুডজর্নি বঁভইয়াজ' জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন—এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো'।

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারি নে।'

তিনি কথা কটি উর্দ হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

অ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কি চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুর-বাড়ি। বৈঠকখানায়

ঢুকে দেখি, দুই মুরুব্বীস্থানীয় বৃদ্ধ বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকেরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি।' এঁরা চমকে উঠলেন কেন। তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তা হলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, 'সলামত?' কথাটা ফার্সী। হয়তো পশতুতেও চলে। অর্থ, 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম, 'এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, "পশতু তা হলে শিখেছেন?"

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলুম, এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মনি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটিও কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনের দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও দেখতে পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজর গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সেই রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

॥ নোনামিঠা ॥

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকবাবাদ পেশাওয়ার দূরে থাক, যাঁরা পাটনা-গয়ার গরম ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরী লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেনই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আল্‌স্টারটার দরকার হবে না তো।'

তবে প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম ; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে দম-পুখতে'র রান্না বা 'পুটপক' করেছে। ফুটবলীদের যে রক 'বগি-টিম' হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভরতি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে, তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্‌-ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপার আমার কিম্ভুত বলেই মনে হল।

ডেক চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা! স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোনও সিলেটি ছিল না। এ রকম মরমিয়া সুরে মা রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তুলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী পোলাও চাখতে, আকাশকুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে, কোনও খরচ নেই ; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এ স্থলেও সে আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা! রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকি দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এই ফরাসী যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি-চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয়, এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম! শেষটায় যখন দেখলুম, ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না করেই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটীতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন্ গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ার তাবৎ দরিয়ায় মাছের মত কিলবিল করে এ-সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটী শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটী ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের সকলের দেখা হবে একই জায়গায়। ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যে-ভাবে একই

তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন ওই কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের সামনে ধরলুম। দুজনেই একসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে এবং আমার বাপঠাকুরদার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানি, আজ তারা আমার দর্শন পেল, আমার সামনে ওসব তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের চাষা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর-পাঁচটা সু-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকি এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়ি-ঘর ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি ?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ওই ত আসল দুঃখ, হুজুর। আমি তো তবু পুরনো লোক। পাউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা। পান্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তাভাত! মূলে নেই ঘর পূব দিকে তিন দোর। হুঁঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হোক, তোমাদের ডাল-ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরে নি।'

বললে, ঠিকই শুনেছেন, সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, কোনও কোনও বন্দরে এখন চাল মাগ্‌গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে। সারেঙ দেশের জাতভাই কিনা, না হলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কি করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ কর নি ?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি ? এদের ভাষা কি জানি "ফ্রিঞ্চি" না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজী হলেও না হয় আমাদের

মুরুব্বীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্যি জাহাজ? ব্যাটারা শুনেছি কোলা-ব্যাঙ ধরে ধরে খায়। সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম 'ব্যস্ ব্যস্।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই রাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইণ্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডি-চেরিতে একটা ঢুঁ মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক। আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানা-টেবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা সু-লিয়োৎনা—অর্থাৎ সাবঅলটার্ন। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলে নিবেদন করলুম।

শুনে তো সে মহা উত্তেজিত। আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারী গলায় ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইনুই···অন-হার্ড-অব—ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক!' আরও কত কী!

আমি বললুম, 'রোস রোস। অত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কোন্ ড্যানিয়েল গিরি করতে গিয়েছিলে, মো গার্সোঁ (বাছা)। ওসব কথা থাক্, চুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিসকে বললে, হাতাহাতি বোতল-কাটাকাটির সম্ভাবনাই বেশি।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, হুঁঃ। কিন্তু এ স্থলে তো দোষী তোমারই জাতভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ওই য্-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুরবেলা ঘুমোয় না। তবু কেন বাঙালীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী তা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আপন আপন ডেক-চেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্যসহকারে অবনতমস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ লাভ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, 'আদপেই না। শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমারই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সায়েব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান, তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারী করেছেন! শুকনো মুখে, ঢোক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান! আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কম্যদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সর্বপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না! তবে মোদ্দা কথা যা বললেন তার অর্থ, আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কি প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিন শো তিরনব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন।

তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তা-ই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসীর হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্ত কণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসীতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এ-রকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো মরবে সারেঙটা।

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পরে চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস-কারী খেয়েই আপনারা আ-হা-হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চীরা যখন কোর্মা-কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করেও এই শপথ করলুম – না, থাক্, আপনার বাড়িতে আমার মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সায়েব আমার কাছে 'চিরকৃতজ্ঞ' হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে-রাত্রে

খালাসীদের তৈরি গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ৎ বেজায় খুশ! মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর, ইটা পরগনার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবৎ? মনু গাঙ্গের পারে।

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারল আমি কত বড় বিদ্যেসাগর! যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনা দারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহা পাষাণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিক বুড়ী মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি কানা করে ফেলেছে, কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক বেঙখেকী, এমন তাড়া লাগালে যে, আমরা পাঁচজন মদ্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাই নে। তবে শুনেছি মেয়েমানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করত। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাঙচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছ?'

বললে, 'না, হুজুর আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটী টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে "না" বলবেন না, আপনার যে কতখানি

দয়ার শরীর সে-কথা দেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'ব্যস্, ব্যস্, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর "না" বলবেন না। আমি বুড়ীর হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি 'হা হা কর কি, কর কি' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয়। ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল! ঝাঁটা কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন মূর্খ বেরয় দেশভ্রমণে। কত না বাহান্ন রকমের যতসব বিদ্‌কুটে, খুদার খামোখা গেরো!

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাব তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার। ওই কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকী সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যে-রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর' 'হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি তো বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে থাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয়

নিরীহ-চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, 'মেরি হ্যাড এ লিট্‌ল্‌ ল্যাম্‌-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরী ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম, 'আমি কি মাদাম মা-ও-মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন্‌ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরসীরা চীনা, ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে-রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদার গুবলেট করে ফেলেছেন! বললেন, 'আঁত্রে (প্রবেশ করুন), মসিয়ো।'

ভরসা পেয়ে বললুম, 'মসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য।'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী স্যুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নক্‌শার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতেই বললুম, আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করেই যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কি করে সে-কথা ইচ্ছা করেই তুললুম না।

ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ, হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্চে, আরও কত কী!

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা! আমাদের করিম মুহম্মদ কিছু নটবরটী নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর-পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূর্ব লাবণ্য! কে বউবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ নয়? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েল পেন্টিঙে আমি এ-রকম দেবশিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর-পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি তোদের বাবার দেশের লোক।' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, 'ল্যাঁদ, সে তঁ্য প্যাই-ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা?' —অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনটাসটিক দেশ, সে-দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, তারি ইচ্ছে সেখানে যায় কিন্তু বাবা রাজী হয় না—তুমি অঁকল্‌ (কাকা), আমাকে নিয়ে চলো,' ওই ধরণের আরও কত কী?

আমি আবার প্রমাদ গুনলুম। কথাটা যে-দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে!

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মসিয়োর রুচি কিসে? চা কফি, শোকোলা (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলিটীতেই বললুম, 'থাক্ থাক্।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে আমার পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরব্বীদের

যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথা ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলোয়, তার মায়ের পায়ের ধুলোয়। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কী দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, হুজুর কোন্ হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম 'বোস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কার মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কি সওগাত চায়, তখন চাইলে ইণ্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুরাগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির, দেশের দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাই নে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara, ইংরাজীতে Sarah), ছেলেটির নাম রোমাঁ। বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, পেঁয়াজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এন। আমার স্বামী এগুলো ভালোবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোঁকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছি নে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, কিন্তু 'আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম দেখেন নি।' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'এই ত বাজান (বাবা + জান, সিলেটীতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান ? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমায় একটা দেবে, আঁকল্—চাচা ? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বললেন, 'চুপ' ছেলেটা বললে 'পার্দোঁ, অর্থাৎ বেআদবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জলি, কী সুন্দর—'

ওঃ !

গুষ্টিসুদ্ধ আমাকে ট্রাম-টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কণ্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো এ (ত্) এত্রাজের ষ্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস করে) ফরাসী বলতে পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক্, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দি ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার।'

করীম মুহম্মদ বললে, সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে উপরে ঘুমুতে যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্ফর্টার।

ইয়োরোপের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিশ কিংবা আম্বুলেন্স ডাকবে। ভাববে, আপনি ক্ষেপে গেছেন। এ-তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে করীম ঢেউপাশার 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্‌বোস্—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কী আপদ।'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে। তা হলে, দয়া করে, আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম, 'আমি কি এ ঘরে "মাগনা" বসেছি, না, এদের জমিদারির প্রজা! কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চল উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কি? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনও আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।

আমি শুধালুম, বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বলল, 'না. হুজুর খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে যে রাত্রে খেতে বলতে পারে নি তার জন্যে দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে নি আসবার সময় বললে, উনি যা বলেন তাই হবে।"

আমি শুধালুম, 'বউ না বললে তুমি আসতে না ?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয় আসতুম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাই নে বলে না-বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভাল লাগল।

আমি শুধালুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে কি বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কি করে ? আর আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায় ? আমাকে লাগাল না কেন ?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভেড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর কানে পৌঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'

'আর মানুষকে কি কখনও ভেড়া বানানো যায় ? কামরূপে না, কোনখানেই না।'

"আপনি তা হলে সব-কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।"

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানি নে হুজুর, হঠাৎ পুলিস লাগালো তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাই নে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নীচে শুয়ে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর কদিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারি নি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম, ডাক্তারেরা কি সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউই কখনও ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখে নি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কখানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প

থামাতে পারল না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যে-রকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা মায়ের কথা ভাবি, আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিত আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, "ভয় নেই, সেরে উঠবে।"

তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে এক জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে, "ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছো। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।"

'ক বছর? কে জানে! এক হতে পারে, চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানি নে।'

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিস।'

'খানা-পিনার কথা তুলব না, হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?'

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগল। হাসপাতালে ছ মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আন্দাজ করতে পারলাম ওদের মনে সন্দেহ হয়েছে, আমি কোনো কুমৎলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না বা কেন? বুঝলাম, রাশিতে জেল আছেই! মনে মনে বললাম, কী

আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না-করেই গেলাম।'

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কি একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রা-টি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলাম পাড়ার লোক ওকে মানে।

'আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কি খেয়েছি জানি নে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাই নি। তাই "বরাণ্ডি"টা বাদ দিল।

'রাত্তে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে। ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা'—

'এ-সব কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে!'

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কি নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের চাষায় সুজান।

বুঝলুম ওটা ফরাসী Suzanne, এবং আর বুঝলুম, যে জাতের লোক আমাদের দেশের মরমিয়া ভাটিয়ালী রচেছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। তথানি স্পর্শকাতরতা এবং কল্পনাশক্তি ওদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তারপর কি বলেছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেকেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখতাম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিই নি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কিছু গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানি নে, হুজুর। কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানত যে, ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।

'কিন্তু হুজুর আমার বড় শরম বোধ হত; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ! কিন্তু করিই বা কী?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমা-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেল এক মস্তবড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি, নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কি করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কি কি নক্শার কাপড় বেরোয়। তারই ভিতর একটা দেখতে পেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

'আমার বাপ-ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে!

'অনেক ইতি-উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁতের দাম কত?" বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারী খুশী হল কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাই নি। বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি গামছা কিনবে কে? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্ফর্টার। দিশী নক্শায়। প্রথম নকশার আধখানা ফুটতে-না

ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবি এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা, ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।'

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু'পয়সা আসতে লাগল। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাব, সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নক্শা নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নকশাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমা তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরি।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ীর কথা পাড়ছি নে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।'

'আপনি বিশ্বাস করবেন না দু-পয়সা হতেই সুজন বললে, "তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না ?" আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমার মা-ই বললে, ব্যাঙ্ক দিয়েও নাকি দেশে টাকা যায়।'

'মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও এক শো। ঢেউপাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি, বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে পরতে তো পারছেই।'

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে "টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম"—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। এ-কথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।'

'আমার মাথায় বাজ পড়ল, সায়েব, যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম. দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুলিসের সঙ্গেও

আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ক্ষাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়াছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি, তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশি নাড়া-চাড়া না করি প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এদেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কি বলেন, হুজুর ?'

তাহা মিথ্যে বলি কি প্রকারে ? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্ সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারির বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, "তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।" এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, "এ-ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।" আমি বললাম, "সুজন, তুই জানিস নে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে "পুতী" (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরিবের সঙ্গে কথা কয় না।" আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'। ওইটুকুই বাকি ছিল!

'সুজনই আজ বললে, "ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।" এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন। আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষরাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল। আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

॥ গাঁজা ॥

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাহুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রকফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রকফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্রগীর' উপাধি দিলেন!

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত। এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা গুড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো!'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনায় গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি-এর পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যে দিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত ; অর্থাৎ দু চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়্গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয়নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন্ করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা।'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয়নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলমগীর।'

আমি বললুম 'হাসালি রে হাসালি। এ আর নূতন কি ...নালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপরে লণ্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলমগীর। বেশ বেশ।

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন ক্বচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলে, হে অজন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই

দুটিকে মুখে ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবার আপনি আপনার—উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবিনে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রত দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোন সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্ সঞ্চয় না করে।' সে আজ কাল ঐ নিয়ে মেতেছে।

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্য—কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?

'তবে শোন। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।'

পার্টিশনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করে। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাকগে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?'

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কিরে? কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছিনে।"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি,—দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

দাদা বললে, "শোন।"

পার্টিশনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক-ই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক্।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।

আমি শুধালুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!"

দাদা বললে, "কী জ্বালা? আমি শ্রীঘর বাস পছন্দ করিনে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্ড—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞান-গম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়সেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।"—দাদা আমার চেয়ে ছ'বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রকফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্‌সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় 'আকাশ-বাণী,' 'ঢক্কা-ডিংডমে' পৌঁছবার পূর্বেই।'

অঞ্জনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডম্‌টা কি চাচা?'

'ডিংডন্‌' মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি 'টম্‌টম্‌' 'টমটমিং' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন,

দাদা বললে, "ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম "থাক্ থাক্। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, ব্যাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো এক দুশমন্। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই; আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু

ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু'মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে সড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখিনি তাই ঠিকঠিক বলতে পারবো না— নির্যাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটিকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিট দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, "গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—"

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া— এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স্‌ পাত্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্‌টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড

মেট্‌রিক্লিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না ?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়। ইস্তক ইংরেজেরও।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি ?—বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্‌সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে ? ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়া মাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি না হয়।

আগে-ভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কি বললে ?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে "হ্যাঁ, তাতো বটেই। 'গাঁজা পোড়নো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগারেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু', সে তখন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাইতো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমনকি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে ? তা সে যাকগে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ভাঁই ভাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিক যায়, ক্ষণে ওদিক যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! প্যাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টা বাৎ। জোয়ান-বুড়ো মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়েছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ'। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে আকর্ণব্যাদন মুখ তুলে নাসা-রন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—।' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু'একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না! তাদের আমি দোষ দিইনে।

ভেবে দেখ্‌, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও জ্বলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দমে বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য ছুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার-জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে। আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাত রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখমুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদুহাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কি টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্পমান—এদৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, "তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ মাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত ছুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব! তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এ-স্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক গেরো। দেখি, দু-খানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে।

হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে

আমি বললুম, "দুটো জীপ না কচু!"

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশায়, সে কী কাণ্ড। চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, "উড়তে?"

"হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠাই দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।"

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায়নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্! তারপর অতি শান্তকণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?' আমি কিছু বলিনি।"

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর! তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

আমি বললুম, তদনন্তর কি হল জানিনে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারিনে, কারণ ঠিক

সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতী পরোটা, দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্‌ডেগ্‌ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।

মশাদা বললে, 'বিলকুল্‌ গুল্‌।'

আমি পরম পরিতৃপ্ত সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল।

অর্থাৎ গুলের রাজা গুলমগীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'

॥ ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী) ॥

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রিটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোঁসাই বললেন, 'যা বলো,যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কিরকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, দ্যাশের—খবর কি ? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম ? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ—তা সে দেখিনি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাকরগঞ্জ ডিস্‌টিক্‌টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে।

ছুটি জর্মন চ্যাংড়া একটা চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ায় জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসত না তা নয়—'ইণ্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সূয্যি রায় বললে, 'চাচা হররবকতই ট্রায়েঙ্গল দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্যু ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্যু ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবিনি। ডি, ই দ্যু; টি, আর, ও পি ত্রো—পি সাইলেণ্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তাদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্যু ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডাগুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য। তখন কি বলিস্? 'ভাগ্নে বৌ দুয়ারে—কোনা কেটে কাল্দি যা।' বরঞ্চ সূয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডাম্কে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্যু ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা লাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে তুটো-না-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস্ কলে?'

আড্ডা সমস্বরে বললে 'প্র্যাক্‌টিস্।'

চাচা বললেন, 'হু। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, স্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। খানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, বার হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে ছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিলক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের াছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদী য়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল র্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে যে ন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার রলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা রাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি রাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে ঠনে-ওলা নামনে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই তারপর বইয়ের দকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্-উন্ট-হাল্‌ব্ —অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ পেয়্যা আঁসিয়েন্—একটুখানি

এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে ?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়েস—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি ?' ফরাসী আমাকে শুধালে 'ক্য দিভিল—কি বললে ও ?' উত্তর শুনে বললে, 'মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়েস নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ এক সঙ্গে তিনজনার তিনখানা বই ঠাস করে আপন আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোড়ে। কি ব্যাপার ? দেখ্‌তো না ছাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী।

সে কী চেহারা। এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে, মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অর্পণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌গে। আমার বয়েস হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি অপূর্ব, অপূর্ব!

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনেই চুপ! আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে

তার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্ মসিয়ো কোন্ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হ্যার্ কোন্ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গেল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই তক্ গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠা চালাকী করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জন লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' এ্যাঁপসিব্‌ল!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' পাঁচ শিলিঙ'?'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল

এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ ব
অদ্ভুত ফ্লাকচুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হ
বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসী
উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাকা খব
মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজু
গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদেই এগারোটাতেই কেবিন নেয়
ফরাসী এখন সকলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান অফার করছে। সে জিতে
পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যাল
আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসে
চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভী
ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটে
এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনে
সর্বশেষে নয় বলে হুরীর পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভাল
মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক
চেয়ারের বদলাবদলীর প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা ব
আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টে
হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে
বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের স
তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তা
হবে জিত।

দু' একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হা
পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, C'est c'est—, এটা, এটা হচ্ছে এক
লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্যত হকের ফৈসালা। ঢলাঢলি
কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। গে
যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকা

কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কি রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাই নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কী সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্রে ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তারপরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনো-গতিকে আমি টিকে আছি আর কি? খাবার সময়ে পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরিফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব! হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাঁকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'কেবিন'। আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্স।'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর ?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্স্ বুঝিসনে ? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্ কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—তুচ্ছাই, এ-সব কি ? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বলে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল ! ভিভ্ ল্য বাঁগাল ! লং লিভ বেঙল !'

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই ? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতেনি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গেল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

হীরো

রক শুধালে, 'চাচা আপনি 'রীডারস ডিজেস্ট' পড়েন ?'

আমি বললুম, 'না ভাই। ওতে আমার দিল্-চস্‌পী নেই।'

ঘণ্টুর শব্দতত্ত্বে কোনো প্রকারের 'দিল্-চস্‌পী' থাকার কথা নয়। তবু শুধালে, 'চাচা, আপনার মুখে এ শব্দটা একাধিকবার শুনেছি। হালে সিনেমাতেও শব্দটা একই ফিল্মে বার দু'তিন কানে গেল। মানেটা কি ?'

আমি বললুম, 'দিল শব্দটা তো জানিস—হৃদয়। আর ফার্সীতে

'চস্‌পীদন' শব্দের অর্থ সেঁটে যাওয়া, সেঁটে দেওয়া। অর্থাৎ বুকে বুক লাগানো। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা। ইংরিজি ইন্‌ট্রেস্ট্‌ শব্দের ঠিক বাঙলা নেই। ফার্সী এবং উর্দুতে বলে দিল্‌-চস্‌পী। যেমন গাওনা-বাজনায় আমার' খুব দিল্‌-চস্‌পী আছে, কিন্তু রেসে বিলকুল দিল্‌-চস্‌পী নেই।'

মশাদা বললে, 'আরো ভালো উদাহরণঃ টাকা ধার নেওয়াতে আমার বিস্তর দিল্‌-চস্‌পী—'

ঘন্টু বাকিটা পূর্ণ করে দিলে, 'কিন্তু ফেরৎ দেওয়াতে বে-দিল্‌-চস্‌পী।'

আমি বললুম, 'বেদিল্‌চস্‌পী আমি কখনো শুনিনি।'

টেটেন শুধোলে, 'কিন্তু ডিজেস্ট ভাল লাগে না কেন?'

আমি বললুম, 'পুরো এক থালা যেন চাটনি। ফরাসীতে যাকে বলে 'অর্‌ দ্যভ্‌র্‌'—ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো সসিজ, সার্ডিন, অলিভ—যা খেতে গিয়ে, আসলে কিন্তু হার্টট্রাবলে, মুখুয্যে জাপানে গত হলেন। শক্ত কামড়াবার মত কিছুই থাকে না—যাকে ফরাসীতে বলে 'পিয়েস্‌ দ্য রেজিস্‌তাঁস, 'পীস অব্‌ রেজিস্‌টেন্‌স।'

টেটেন বললে, 'কিন্তু সর্বশেষে যে মোটা বইয়ের সারাংশ থাকে?

আমি বললুম, 'সে যেন গ্লাস-কেসের ভিতরকার ক্ষুদে তাজমহল। ওতে যদি সেই আনন্দই পাওয়া যেত তবে আসল তাজ দেখতে যেত কে?

অজনদা শুধলে, 'কিন্তু মশার চোখ যদি আরো দু'ইঞ্চি ছোট হত তাহলে কি কিছু ফের-ফার হত?'

রকের বড়দা কথা কয় কম, কিন্তু কেউ কাউকে ছোবল মারলে সেও সরেস মাল ছাড়তে জানে। পানের পিচ বাঁচিয়ে আকাশপানে মুখ তুলে বললে, তোমার ঐ ভেটকি-বদন দেখার থেকে নিষ্কৃতি পেত।'

টেটেন বললে 'কী বিপদ! আমার প্রশ্নটা শুধোবার ফুর্সতই পাচ্ছিনে যে। আচ্ছা, চাচা, ঐ 'আমার পরিচয়ের অবিস্মরণীয় মানুষ' ঐ সিরীজের লেখাগুলো কি সত্যি, না বানানো?'

আমি অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, 'মিথ্যা আর সত্যে পার্থক্য করা বড় কঠিন—বিশেষ করে আর্টে, সাহিত্যে। যেমন মনে কর, তুই একটা ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্ট করছিস। সেখানে একটা শুকনো খেজুর গাছ তোর

পছন্দ না হওয়াতে তুই সেটা তুলে নিয়ে সেখানে একটা কদম গাছ লাগালে কেউ কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু যদি কারো ফোটোগ্রাফ তুলতে চাস তবে সেখানে কোনো লিবার্টি নেওয়া চলবে না। অথচ সেখানেও সমূহ বিপদ। লেনসটার উপরে হয়তো ময়লা জমেছে, ফিল্মটা হয়ত পুরনো, ফোকাসে ভুল হয়ে গেল—ফলে মূলের সঙ্গে মিল রইল কমই। ঠিক তেমনি 'আমার অবিস্মরণীয় মানুষের' বর্ণনা আমি যখন দিই তখন ভাবি সত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়েই সেটা আমি করছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গী (লেন্‌স্‌), আমার স্মৃতিশক্তি (ফিল্‌ম্‌—পূর্ণা কিংবা নয়া ঘটনা) যে ঠিক ঠিক বর্ণনা দিতে সাহায্য করছে কি করে জানবো ? তিন সাধু জন আদালতে হলফ খেয়ে তিন রকমের বর্ণনা দেয়—সে তো আকছারই হচ্ছে। আর যে 'অবিস্মরণীয় চরিত্রের' বর্ণনাটা পড়ে তোর প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, সেই 'চরিত্রকে' সেটা পড়ে শোনালে সে হয়তো ঝাঁটা হাতে তাড়া লাগাত। আমার এ রকম একটা চরিত্রের সঙ্গে—'

মুকুলদি কিমামের কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'সেইটেই দয়া করে বলুন—এসব আবোল তাবোল বকে কি হবে ?' মুকুলদি উত্তম মুক্তি তুলতে জানে, ছবিও আঁকতে পারে ; তাই এসব থিয়োরিতে তার দিল্‌-চস্‌পী নেই। পোষ্ট-মর্টেমে খুনীর কি ইন্‌ট্রেস্ট্‌ ?

* * *

'সে আমার প্রথম যৌবনের কথা। দেশে ফিরে বসেছি—রকের না বাড়ির—বড়দার বৈঠকখানার বারান্দায়। এমন সময় দেখি, রাস্তার উপর দিয়ে দূর থেকে যেন একটা সাক্ষাৎ তালগাছ ঝড়ের বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাড়ির সামনে আসতে দেখি, সে এক অপরূপ প্রাণী। নিদেন ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তার উপর ভদ্রলোক পরেছেন প্রায় এক ফুট উঁচু তুর্কী টুপী। ঝড়ের মত চলার বেগে সেই টুপীর ফুন্না বা ট্যাসেল টুপীর উপর চর্কিবাজির মত চক্কর খাচ্ছে। বারান্দা থেকে রাস্তা অন্তত দশ গজ দূরে, তবু তাঁর গতি-বেগ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার সেই দু ফুট চওড়া বিরাট পুরু লংক্লথের পাজামার ঘর্ষণ থেকে। কদম এক এক খানা যে দৈর্ঘ্যের ফেলছেন তাতে মনে হয় পাজামার ভিতর বুঝি রণ-পা

লুকানো রয়েছে। আচকানটা নেমে এসেছে প্রায় জুতো পর্যন্ত— পাজামার ইঞ্চি চারেক দেখা যায় কি না যায়। ইয়া বিরাট চাপ দাড়িতে বুক ঢাকা। তুর্কী টুপীর নিচের থেকে নেমে এসেছে ঢেউ খেলানো মিশ কালো ঘন বাবরী চুল—প্রায় গ্রেটা গার্বো লেন্‌থ্‌। চলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা দুলছে যেন সার্কাসের লোহার ডাণ্ডার দুলনা তাঁবুর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি। বাঁ বগলে ফুলস্ক্যাপ কাগজের রোল-করা এক বিরাট বোন্দা। দৃষ্টি সোজা সমুখ পানে। চলেছেন রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে।

সাঁই সাঁই শব্দ করে তিনি আমাদের বৈঠকখানা পেরিয়ে গিয়ে মোড় নিলেন বাবার বৈঠকখানার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বাবার চাপরাশী মহম্মদী এসে আমায় তলব করলে। ফতুয়াটা গায়ে চড়াতে না চড়াতেই দেখি সেই আচকান-পাজামা-পরা তালগাছ পূর্বের চেয়েও গতিবাড়িয়ে আমাদের বারান্দায় এসে হাজির। আমি সালাম করার পূর্বেই আমাকে সালাম করে আসন নিলেন শক্ত কাঠের চেয়ারের উপর—যদিও আমি বেতের চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়েছিলুম।

কুশলাদির প্রথম কথাতেই আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর গলা শুনে। আমি ভেবেছিলুম, তাঁর গলা থেকে প্রতিটি লব্‌জো বেরবে তোপের শব্দ নিয়ে, নিদেন পক্ষে বন্দেমাতরমের আওয়াজ ছেড়ে। কোথায় কি? ঠিক যেন ওস্তাদ আব্দুল করীম খান সাহেবের মধুর কণ্ঠস্বর—এবং সেও এত মৃদু যে তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না। গলা থেকে মানুষ চিনতে গেলে বলতে হবে লোকটি বড়ই নিরীহ। আর দ্বিতীয় জিনিস লক্ষ্য করে আরো আশ্চর্য হলুম। ঐ বিরাট-বপু লোকটার জুতোর নম্বর ছয় হয় কি না হয়।

বোধ হয় একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'দেখুন দেখি, আপনার ওয়ালিদ্‌ সাহেব (পিতা) আমাকে কী বিপদে ফেলেছিলেন। আপনাকে ডেকে পাঠালেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে! তাও কখনো হয়! আমি তো এক রকম তাঁর ইচ্ছা অমান্য করেই এখানে ছুটে এলুম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি আপত্তি করেননি।'

কথা-বার্তায় প্রকাশ পেল তিনি মৌলানা জালাল উদ্দীন রূমীর কাব্য মসনবী খানা অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন। আমার পিতৃদেবকে দেখাতে এসেছিলেন। তিনি শুনে বলেছেন, এসব ব্যাপারে নাকি আমার দিল্-চস্পী প্রচুর তাই আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

আমি তো অবাক! বিরাট সে গ্রন্থ। সে আমলে এর ইংরিজি অনুবাদও কেউ বুক বেঁধে করে উঠতে পারেন নি।'

মশাদা শুধোলে, 'কে যেন তাঁর একটি গল্প 'তোতা-কাহিনী' না কি যেন অনুবাদ করেছে—তাও গদ্যে। কিন্তু গল্পটি অসাধারণ সুন্দর। পুরো কাব্য কি এখন ইংরিজিতে পাওয়া যায়?'

আমি বললুম, 'যায়। নিকল্সন্ না কে যেন দশ না চৌদ্দ বছর খেটে করেছে—তাও গদ্যে।

আর সে কাব্য অনুবাদ করা কি চারটিখানি কথা!'

মশাদা বললে 'বড্ড কঠিন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। অতি সহজ। মিল, ছন্দ, উপমা, ধ্বনি এতই সহজ যে অনুবাদে সে সরলতা কিছুতেই আনা যায় না। এ ধরণের বইকেই ইংরিজিতে বলা হয়, ডিস্পেয়ার অব্ট্রেন্স্লেটারস্।

ভদ্রলোক তখন বিস্তর ইতি-উতি করার পর বগলের বোন্দাটা নামিয়ে, লম্বা ফুলস্কেপ কাগজ হাত দিয়ে ডলে সোজা করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।'

রকফেলাররা একবাক্যে শুধোলে, 'কি রকম হয়েছিল অনুবাদটা?'

আমাদের রকের এই একটা মস্ত গুণ যে সবাই বড় দরদী। প্রশ্নের সুরেই বোঝা গেল তারা কি উত্তর প্রত্যাশা করছে।

টেটেনের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এখন বুঝলি টেটেন, সত্য-কথন কতখানি কঠিন, হুবহু ফোটোগ্রাফ তোলাতে কতখানি কস্ত।'

টেটেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'একদম রদ্দি বুঝি?'

আমি বললুম, 'না, এই মাঝারি। বরঞ্চ বলবো, মসনবী অনুবাদ কী কঠিন কর্ম জানা ছিল বলে মনে হল, আশাতীত ভালো। আর ছন্দটি নিয়েছিলেন রাজসিক, তাঁর দাড়ির চেয়েও লম্বা ;—

'কন সদাগর তোতা পাখীটিরে কোনো ভয় তুমি রেখো না মনে,
সওগাত আমি নিশ্চয় আনিব খুঁজিবো তাহারে শহরে বনে।'

মশা বললে, 'তার পর' ?

'ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'অনুবাদটা আমারই পছন্দসই হয়নি। কিন্তু কি জানেন, এটা পড়ে যদি যোগ্যতর ব্যক্তি একখানা উত্তম অনুবাদ করে তবেই আমার শ্রম সফল।'

এতখানি বিবেচক লোককে উৎসাহ দেবে না কোন পাষণ্ড। আমি বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান।'

রাত্রিবেলা বাবার কাছে শুনলুম, ভদ্রলোক ছ'মাইল দূরে গ্রামে বাস করেন, সেখানকার ম্যারিজ রেজিস্ট্রার, অর্থাৎ কাজী সাহেব। ঝাড়া পনেরো বছর মুসলমান শাস্ত্রাদি দিল্লী (দেওবন্দ), রামপুরে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরেছেন। ফার্সী এবং উর্দুতে উত্তম কবিতা লিখতে পারেন, কিন্তু দিল্-চস্পী বাঙলাতে,—যদিও পাঠশালার পর বাঙলা অধ্যয়নের সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠেনি।

একটা পান দে না রে, ও মুকুলদি।

তারপর কাজীসাহেব মাঝে মধ্যে আসেন, অনুবাদ শুনিয়ে যান।

আমার মা ওঁকে খাওয়াতে বড্ড ভালো বাসতেন। কি করে জানিনে, জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, পাছে তাঁর স্ত্রী ভাবেন তিনি একটা আস্ত রাক্ষস তাই বাড়িতে খান অল্পই। মা'র হয়ে আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করতুম আর তিনি প্রতিবার খেয়ে উঠে দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বলতেন, 'এই বাড়িতেই আল্লা আমার দানাপানি রেখেছিল।'

এর কিছুদিন পরেই আমাদের অঞ্চলে হাহাকার উঠলো। কেঁচুগঞ্জ অঞ্চলে খেয়া নৌকো ডুবিতে বিস্তর লোক মারা গিয়েছে—পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যতটা ভয় করা হয়েছিল ততটা নয়—কারণ সিলেট পানি-জলের দেশ—সাঁতারে অক্ষম অল্প লোকই। কিন্তু আসল কথা খবরের কাগজে বেরল পরের দিন ;—

"প্রকাশ, মুনশীবাজার গ্রামের কাজী মৌলবী শের মুহম্মদ খান ঐ খেয়া নৌকা ডুবির সময় একটি মণিপুরী রমণীকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন। রমণী সন্তরণে সম্পূর্ণ অক্ষম। কাজী সাহেব সেই রমণীকে অবশ্য মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ সন্তরণ করিয়া অবশেষে তীরে অবতীর্ণ হয়েন। আরও প্রকাশ মণিপুরী রমণীর ওজন প্রায় আড়াই মণ এবং কাজী সাহেব যখন পারে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার ইজার-আচকান এমন কি তাঁহার তুর্কী টুপী কিংবা একটি পাদুকাও স্থানচ্যুত হয় নাই।"

হাজরা রোডের রক্ হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'শাবাস!'

অঞ্জনদা বললে, 'চাচা, আপনার বর্ণনাতে যা হয়নি, এই ঘটনার বিবৃতিতে তা হয়ে গেল—এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার কাজী সাহেবের গতরে কী অসুরেরই জোর ছিল।'

রকের বড়দা বললেন, 'ল্যাটে বুঝলে হে অঞ্জন, ল্যাটে।'

আমি বললুম, 'খবরটা প্রথম পড়েছিলেন বাবা। তিনি আমাদের সবাইকে ডেকে সেইটে রসিয়ে পড়লেন। দেখি দেমাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ছে না—তাঁর কাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

ইতিমধ্যে চাপরাশী মহরমদী এসে উপস্থিত। সে বাজারে খবরটা শুনে এসেছে। আস্তে আস্তে আমাকে বললে, জানেন, ঐ মনিপুরী ওরৎটা কে?' আমি বল্লুম, 'না তো'। বললে, 'ঐ যে হাতীর গতর ইয়া লাশ বেটি। হাটের দিন আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে ধামায় করে গামছা বিক্রী করতে যায়।'

বাবা, দাদারা আমি সবাই স্তম্ভিত। ও রমণীর বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। বোন্দা বোন্দা, পিণ্ড পিণ্ড, ধামা ধামা স্রেফ চর্বি দিয়ে তৈরী সে রমণীর দেহ। মাথায় ধামা। সর্বাঙ্গ থলথল করছে আর ঘোর শীতকালেও সর্বদেহ থেকে গলগল করে ঘাম ঝরছে। হাঁপাচ্ছে আর এগোচ্ছে, গাছ-তলায় বসে জিরোচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে। প্রতিদিন চর্বির গোলা বেড়েই যাচ্ছে এবং শেষের দিকে ওর ঠেলায় তার মুখ আর চোখ-দুটো প্রায় দেখাই যেত না। এই তো দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে।

নদীর স্রোতে কাজী সাহেব এই হিমালয় বয়েছেন পাক্কা এক ক্রোশ!

আমার বাবা প্রাচীনপন্থী ধর্মভীরু লোক ছিলেন। বেপর্দা রমণীর দিকে তাকাতেন না। এখন দেখা গেল, সে রমণী তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'ও, তাই নাকি!' বলে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমরা গুড়িগুড়ি বড়দার বৈঠকখানায় গিয়ে প্রথম এক চোট চাপা হাসিটা হেসে নিলুম—সক্কলের মুখে ঐ এককথা, 'সমুচা তুর্কী টুপী জুতো সহ কাজী সাহেব উঠলেন নদীর ওপারে—ওঁর বগলমে মনিপুরী ঔরৎ—ইয়া লাশ।'

ইতিমধ্যে বাবা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একখানা পোষ্টকার্ড—কাজী সায়েব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে এবং একটি মানুষের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। আমরা পড়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দিন দুই পর সে কী তুল-কালাম কাণ্ড! প্রথমটায় দেখলুম কাজীসাহেব টর্নাডো বেগে উঠছেন বাবার বারান্দায়—আর এই প্রথম দেখলুম, তাঁর বগলে মসনবীর বোন্দা নেই, যদিও হাটে মাঠে ঘাটে খেয়াপারে মসজিদে তাঁকে বোন্দাহীন অবস্থায় কেউ কখনো দেখেনি। আর এই প্রথম শুনি তাঁর সেই মৃদুল স্বর আর নেই। নাক দিয়ে সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণী বলদের মত শ্বাস-নিশ্বাস প্রস্ফুরিত হচ্ছে, চাপ দাড়ি চিত্তিরবিত্তির ছড়িয়ে পড়েছে, চোখে মুখে জুগুপ্সা—জিঘাংসা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর বার বার একই কথা বলছেন, 'আপনিও, আপনিও!'

আমরা হাবা বনে খনে বাবার দিকে খনে কাজী-সাহেবের দিকে তাকাই। বাবাই বুঝিয়ে বললেন, 'কাজী বলছেন, ঐ মনিপুরীকে বাঁচাবার কোন মৎলবই তাঁর ছিল না, তিনি নাকি—'

কাজী সাহেব কাঁকিয়ে উঠলেন, 'আমাকে ধরেছে কোমরে জাবড়ে। তওবা, তওবা কী ঘেন্না—' তিনি তারই স্মরণে যেন শিউরে উঠলেন। আমরা যে হাসি ঠেকাতে পেরেছিলুম সে নিতান্তই আল্লার মেহেরবানী।

কাজী-সাহেব বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তিনি রুস্তম নন,

সোহরাব নন, কারো প্রাণরক্ষা করে বীর পুরুষের খ্যাতি তিনি চান না, তিনি আপন প্রাণ নিয়েই তখন ব্যস্ত, ঐ দুশমন্ রমণীটা যদি ও রকম তাঁকে জাবড়ে না ধরতো—আরো কত কী।

বাবা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'চেষ্টা করলেই তো আপনি নিষ্কৃতি পেতে পারতেন।'

কাজী-সাহেবের চোখের তারা তাঁর তুর্কী টুপীর ফুন্নায় গিয়ে ঠেকেছে। এবারে কক্‌কিয়ে বললেন, 'হুজুর ঐ ওরতের লাশ তো দেখেননি—তাই বললেন।'

নিতান্ত সত্যের অপলাপ হয় বলে বাবাকে আপত্তি জানাতে হল।

আমি বললুম, 'যাকে আপনি দু'মাইল বয়ে নিয়ে যেতে পারলেন—'

কাজী-সাহেব প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'কে বলে দু'মাইল!' আমি ঐ খবরের কাগজওলাদের যদি একদিন পাই' হাত দুটো তিনি মুষ্টিবদ্ধ করলেন। 'এক মাইল হয় কি না হয়।' আমরা বললুম, 'এক মাইলই সই, আধ মাইলও সই—তাই কি কম? ফেঁচুগঞ্জের ঐ জলের তোড়ে, মাঝ গাঙে—'

কাজী সাহেব বললেন, মাঝগাঙে তোড় কম—'

মোদ্দাকথা, কাজী সাহেবের গোড়ার দিককার বিরক্তি এখন ঘোর ক্রোধে পরিণত হয়েছে। টেলিগ্রাম, চিঠি, গ্রামের ছোঁড়াদের 'বন্দে-মাতরম,' 'জিন্দাবাদ' চীৎকারে তাঁর সুখ-শান্তি গেছে। মসনবী সিকেয় উঠেছেন। তাকে আত্মত্যাগী, মৃত্যুভয়ে অকাতর পরম বীরপুরুষ বানিয়ে কতকগুলো হনুমান তাকে বাঁদর নাচাতে চায়। তিনি ঐ মর্মে একটি দেমাঁতি (dementi)—প্রতিবাদ—লিখেছেন। সেইটে বাবাকে দেখিয়ে কাগজে পাঠাবেন এমন সময় বাবার কার্ড পৌঁছে তাঁর হৃদয় বেদনা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবাদ তিনি লিখেছিলেন অতিশয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যদিও অজ্ঞলোক সেটাকে বাঙলা মনে করতে পারে;—

"এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাত কৃত হইতেছে যে অধম শের মুহম্মদ খান কদাপি বীরর্ষভ নহে। আত্মরক্ষার্থেই সে শশব্যস্ত—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

প্রতিবাদটি পড়তে পড়তে এত দুঃখের ভিতরও কাজী সাহেবের মুখে ্ই প্রথম এক ছটাক হাসি ফুটলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, ভাষাটা কি রকম হয়েছে ?'

কোরাস { বড়দা—'অপূর্ব অপূর্ব !'
মেজদা—'অনবদ্য, অনবদ্য !'
আমি—'সাধু, সাধু !' }

বাবা বললেন, 'পত্রিকাওলারা এটা ছাপাবে না।'

কাজী সাহেব আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'হক্ কথার প্রতি তাদের কি কানোই মহব্বৎ নেই ?'

বাবা বললেন, 'ওরা একটা জিনিস নিয়ে মেতেছে। যে বেলুন ওড়িয়েছে সেটা নিজেরাই ফুটো করতে যাবে কেন ?'

এমন সময় আমাদের বাড়ির বুড়ী দাসী এসে বললে, মা বলে পাঠিয়েছেন, কাজী সাহেব যেন নেয়ে খেয়ে যান—এরকম লোককে নাকি খাইয়ে সুখ।

'ইয়াল্লা' বলে কাজী সাহেব দু'হাতে মাথা চেপে তক্তপোষে বসে পড়লেন।'

অঞ্জনদা আমাদের ভিতর বিচক্ষণ সংসারী লোক। সে বললে, 'চাচা, আপনারা ধীরস্থির ভাবে ওঁকে বোঝালেন না কেন, তিনি যত আপত্তি জানাবেন শ্রদ্ধাটা তত বেশী গড়াবে। তিনি চুপমেরে থাকলে গেরোটা আপনার থেকেই খুলে যাবে।'

আমি বললুম, 'বাবা তো ওঁকে সেই কথাই বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজী সাহেবের আপত্তি, তা হলে তিনি যে একটি মহাপুরুষ সে 'অপবাদ' তাঁর থেকেই যাবে।

তা সে যা-ই হোক, আমরা প্রতীক্ষা করে রইলুম, কাগজ প্রতিবাদ ছাপায় কি না। আমরা থাকি মহকুমা টাউনে, কাগজ বেরয় সদরে।

বুধবার সকালে কাগজ আসবার কথা। মঙ্গলবার রাত দশটায় কাজী সাহেব পুনরায় তেড়ে উঠলেন বাবার বারান্দায়। তিনি আকছারই চোদ্দমাইল দূরের স্টেশনে 'বেড়াতে' যেতেন। সেখান থেকে কাগজ

খানা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমাদের অনুমান ভুল, 'বিজয়শঙ্খ' ফলাও করে কাজি সাহেবের দেমাঁতি ছাপিয়েছে। কিন্তু—

কাজী সাহেব চিল-চ্যাচানীতে ডুকরে উঠলেন, 'দেখুন, কি সম্পাদকীয় লিখেছে। তারপর কাতর কণ্ঠে বাবাকে বললেন, 'খান বাহাদুর সাহেব, আল্লা আমার সাক্ষী,—আমি জীবনে কখনো কারো অমঙ্গল কামনা করিনি, তবে এরা আমার পিছনে লেগেছে কেন?'

বড়দা চেঁচিয়ে পড়লেন,

"আমরা বাঙালী। বঙ্গ ভাসা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। আমাদের শিরায় শিরায় ধমণীতে ধমণীতে বাঙালী-রক্ত প্রবাহিত। মা বঙ্গভারতী, তোমার বিজয়-শঙ্খ এই পতিত জাতির পাপ-তাপ দূর করুক।"

রক এক বাক্যে চেঁচিয়ে বললে, 'চাচা, আপনার মেমারিটা খাসা।' আমি বললুম, 'মেমারি না কচু!' 'বিজয় শঙ্খের সম্পাদক তু হপ্তা অন্তর অন্তর এই ফরমূলা মোকা-বেমোকায় কোনো না কোনো জায়গায় ঢুকিয়ে দিত, তাই সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। তা সে যাই হোক বঙ্গভারতী ফারতীতে কাজী সাহেবের কণামাত্র আপত্তি নেই—আপত্তি যেখানে সম্পাদক বলেছে, "ও হো হো কী অসাধারণ বিনয়ী পুরুষ! সম্পূর্ণা অপরিচিতা রমণীর জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত মহাপুরুষের পক্ষেই এবম্বিধ বিনয় সম্ভবে। অপিচ এই ঘোর কলিকালে অন্যপক্ষ হইলে আমরা হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করিতাম. কিন্তু কাজী শের মুহম্মদ খানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের যোগাযোগ পূর্বাহ্ণেই একাধিকবার হইয়া গিয়াছে।

বড়দা এক এক লাইন পড়েন আর পুরনো তানপুরোর কান মললে যে রকম সেটা কাঁাও ম্যাও করে ওঠে কাজী সাহেব তেমনি আর্তনাদ করে উঠেন।

বড়দা দরদী চিঠি হেনে পড়ে গেলেন, "ত্রিযামা যামিনী প্রদীপ শিখা অনির্বাণ রাখিয়া তিনি যে পারস্যের কবিশেখর মৌলানা জালাল উদ্দীন রূমীর পর্বতপ্রমাণ বিরাট মসনবী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গদে

্গুলে বিজয়মাল্য পরিধান করাইতেছেন তাহা কি আমাদের ন্যায় র্বাচীন জনেরও অজ্ঞাত ?”

কাজী সাহেব দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে বললেন, ‘উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ।’

মেজদা বললেন, ‘কাজী সাহেব, এ আপনার অন্যায়। অবিনাশ চক্রবর্তী এস্থলে ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের কর্তব্য কর্ম করেছে—কণামাত্র মিথ্যা বলেনি।’

কাজী সাহেব মৃদুকণ্ঠে বললেন, ‘না বিয়োতেই কানাইয়ের মা!’

কিন্তু কাজী সাহেবের ‘পুণ্যের’ ভার পূর্ণ হল যখন দেখা গেল সর্বশেষে সম্পাদক অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চু সদাশয় সরকার তথা ছোটলাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ দেশমাতৃকার হয়ে তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছেন কাজী সাহেবের এই বীরত্বের যেন যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, এবং এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বর্ণপদক দানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করেছেন।

কাজী সাহেব ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি মুখো হলেন।

আমরা কিছুতেই তাঁকে ঠেকাতে পারলুম না।’

ঘণ্টু বললে, ‘একেবারে ক্লাইমেক্‌সে পৌঁচেছে তখন। তারপর?’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ। তবে আমার কপাল ভালো, কাজী সাহেবের সে-‘দুর্গতি’ আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। তার কিছু দিন পরেই আমাকে ফের বিদেশ যেতে হল। তবে আমার ছোট বোন আমাকে জানালে, যখন ‘বিজয়শঙ্খই’ প্রথম খবর ছাপে যে সদাশয় সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে স্থির হয়েছে, কাজী সাহেবকে একটি গোল্ড মেডেল দেওয়া হবে, তখন তিনি বাবার কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করবেন কি না, কিংবা লাটসাহেবকে—তাঁরই স্বহস্তে মেডেল পরিয়ে দেবার কথা—সব কথা গোপনে চিঠি লিখে জানাবেন কি না,—কারণ সবাই নাকি তাঁকে বলেছে, এসবের কোনো-কিছুটা করলেই লাটসাহেব বিগড়ে যেতে পারেন এবং তাঁর চাকরী নিয়ে টানাটানি লেগে যেতে পারে। বাবা বলেছেন, ওঁর উচ্চবাচ্য না করাই উচিত।’

দম নিয়ে বললুম, 'কাজী সাহেবের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই বোধহয় তিনি মেডেল নিতে রাজী হয়েছিলেন। চাকরী গেলে বীবীকে খাওয়াবেন কি?

কিন্তু আমি কল্পনার চোখেও দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠি।

বিরাট সভা। লেকচারের পর লেকচার চলছে কাজী সাহেবের বীরত্বের গুণকীর্তন করে, অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চুর 'স্বরচিত' বিশেষ গান গাওয়া হচ্ছে, কাজী সাহেবের গলা জিরাফের মত লম্বা হলেও অত মালার স্থান হয় না, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গদ্যে পদ্যে হরেক রকম অভিনন্দন পড়া হচ্ছে, কাজী সাহেবের গাঁয়ের লোক বিস্তর নৌকো ভাড়া করে এসে সভাস্থল গুলজার করে তুলেছে—আর তার মধ্যিখানে কাজী সাহেব ঘেমে ডোল—ভাবছেন, আল্লার মালুম কি ভাবছেন, একী উৎকট সংকট, এ কী দুঃস্বপ্ন, এ কী বিভীষিকা!

বোন লিখেছিল, সেদিন সন্ধ্যায়ই শহরে খবর রটে, লাটসাহেবের এডিসি নাকি শুনেছে, সাহেব কাজী সাহেবের আচকানে মেডেলটি যখন পিন করেন তখন নাকি মৃদুকণ্ঠে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলেছিলেন, 'কাজী, তোমার সাহসের সঙ্গে মিলিয়ে গড্ তোমার দেহ দিয়েছেন। কোনোটারই অবহেলা করো না।'

সর্বনাশ!

কাজী সাহেবের শেষ ভরসাটুকুও গেল। তিনি মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন, মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধি, দেশের রাজা লাটসাহেব অন্তত ধরে ফেলতে পারবেন যে তিনি হীরো নন।'

*　　*　　*

রকফেলারগণ প্রথমটায় চুপ! তারপর কলরব করে অনেকগুলো প্রশ্ন শুধোলে। রকের বড়দা এ পাড়ার একটি মাত্র লোক যে পয়সা দিয়ে বই কিনে পড়ে। মুখ উপরের দিকে তুলে তারই গহ্বরে এক মুঠো ঔড্রদেশীয় গুণ্ডি ফেলে শুধালে, 'আর মসনবী না কি যেন—তার কি হল?'

'জানিনে। তার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা মা গত হলেন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেল। দাদারা এদিক ওদিক ট্রানসফার হয়ে গেল।

বাড়িতে তালা পড়ল। তারপর পার্টিশেন। হয়ত পূব বাঙলায় বেরিয়েছে। সে-সব খবরতো এখানে পৌঁছয় না।

তবে একটা শেষ সুখবর বোন আমাকে দিয়েছিল। কাজী সাহেব গরীব বলে স্ত্রীকে এক দানা গয়না দিতে পারেন নি। সেই কুলোপানা সোনার মেডেল পেয়ে বউয়ের মুখের খুশী দেখে কাজী সাহেবের মুখেও হাসি ফুটেছিল।'

*　　　*　　　*

দুপুর বেলা একলা একলি পেয়ে টেটেনদি শুধোলো, 'আচ্ছা চাচা, এর কতটা সত্যি আর কতটা—?'

আমি বললুম, 'দিদি, তাইতো তোকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'অবিস্মরনীয় চরিত্র' যখন লোকে আঁকে তখন কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা, কে বলতে পারে?

॥ স্নব্ ॥

সমূচা হাজরা রোড হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সমুপস্থিত। অর্থাৎ হাজরা রোডস্থ আমাদের রকফেলারগণ। অঞ্জনদা, মশাদা, ঘণ্টু, মুকুলদি —ইস্তক পাঁচ বছরের গুড়গুড়ি।

আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ ইত্যাদি শেষ হওয়ার পূর্বেই মশাদা বললে, 'ওঃ কী গরমটাই না পড়েছে। ফোকাস্ ঢিলে করে দিলে।'

মশাদার ঐ একটা গুণ। কোনো নূতন টেক্নিকাল কাজ আরম্ভ করলে, তার প্রচলিত বুলিগুলো অন্য জিনিসে চট করে ট্রান্সফার করতে পারে। এই দুর্দিনে সবাই যখন ফটোগ্রাফি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে সেই সময় মশাদা ঐ কর্মে মন দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যারকণ্ডিশন কোচের স্টুয়ার্ড, মেট, রেস্তোরাঁ-কারের বাবুর্চী ইত্যাদি যাবতীয় চাকর-নফর, সরকারী ভাষায় ক্লাশ ফোর স্টাফ সারি বেঁধে আমায় গার্ড অব অনার দিলে!

আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই ভ্রুকুটিকুটিল বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

রক্ চুপ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই দেখি ঘণ্টু হনহন করে পালাচ্ছে। মুকুলদি হেঁকে শুধালে, 'ব্যাপার কি? ঘণ্টুদা পালাচ্ছো কোথায়?'

বললে 'চাচা ক্ষেপেছে। নইলে অ্যারকণ্ডিশনে আসার পয়সাই পায় কোথায়, তাবৎ কোচ ওকে সেলাম ঠুকবেই বা কেন? দেদার টিপ্‌স্ দিয়েছে নির্ঘাত। এবারে চাচা আমাদের কাছে টাকা ধার চাইবে।'

রক্ বললে, 'সত্যি তো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

আমি বিরস মুখে বললুম, 'বাড়ি গিয়ে।'

চা টা দেখেই জানটা তর-জল হয়ে গেল। চা আমরা বড় একটা খাই নে। কিন্তু সামনে না থাকলে আমরা আসামী খুনে। (আমি 'অসমিয়া' বলিনি, মনে থাকে যেন) ওটা একটা সিম্‌বল্। মা কালী নৈবেদ্য ছোঁন না, কিন্তু না দিলে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'হালের বলদ বিক্রি করে রে, পালের গাই বিক্রি করে।'

সবাই শুধালে, 'সে আবার কি?' এরা শহুরে। 'হালের বলদ', 'পালের গাই' বলতে কি বুকের পাঁজর, জিগরের খুন জানে না?

বললুম, 'তাই দিয়ে অ্যারকোচের টিকিট কেটেছি—তোরা কলকাতার একশ'তে হিমসিম খাচ্ছিস। আমি যখন দিল্লী ছাড়ি তখন সেখানে ১১৮°।

পদ্মায় যখন উজোন বাইতে হয় তখন পাল যদি বাতাস পায় তা হলে দেখবি—আকছারই দেখবি—একা একজন মাল্লা মাঝ পদ্মা দিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আর সে কী এফর্ট্‌লেস্ ব্যাপার। লোকটার ডান হাত মোলায়েমসে অতি আলগোছে হালের উপর রাখা—যেন কোনো মহারাজ দামী সিংহাসনের মখমল-মোড়া হাতলের উপর হাত রেখে পোট্রেট পেন্টিং করাচ্ছেন। আর বাঁ হাত দিয়ে ধরেছে পালের দড়ি। যেন প্রেমিক অলস ভরে প্রিয়ার বিনুনিটি তুলে ধরেছেন। প্রিয়া পালের বুক ফুলিয়ে উড়ে চলেছেন উজানে।

তখন যদি সে দেখে আরেক নৌকায় তিনজন মাল্লা হাল বৈঠা মেরে মেরে নেয়ে-ভিজে কাঁই হয়ে যাচ্ছে, এক বিঘৎ এগুতে পারছে না, পাল

নেই বলে, তখন সে চিৎকার করে তাদের বলে, 'হালের বলদ বিক্রয় কর, পালের গাই বেচে দে'—বাকিটা আর বলে না সবাই জানে। তার মানে ঐ পয়সা দিয়ে পাল কেন।'

টেটেনদি উপস্থিত অর্থাভাবে। এটা সেটা বেচছে। নবীন হৃদিশের আশায় শুধোলে, 'আপনি কি বেচলেন?' ইঙ্গিতটা বড় রূঢ়।

'মর্নিং স্যুট, ইভনিং জ্যাকেট—

বড়দা পিচভরা মুখ আকাশ পানে তুলে বললে, 'ভালো করেন নি। এই আমি কেদার-বদ্রী হয়ে এলুম। পথেই যত বাহার—দেবতা দেখতে এমন কিছু না, কিন্তু যখন সাঁঝের ঝোঁকে ইভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন দেখায় লাভ্‌লি।'

বিগ্রহের ঈভনিং জ্যাকেট! ওঃ, বুঝেছি। ঠাকুরকে যখন সন্ধ্যায় সিঁদুর চন্দন দিয়ে শৃংগার করানো হয়। সেইটে বড়দার ভাষায় ঈভনিং জ্যাকেট পরা। বুঝতে সময় লেগেছে। দিল্লীতে তিন বছর থেকে থেকে আক্কেল-বুদ্ধি ভোঁতা মেরে গিয়েছে।

টেটেনদি শুধলে, 'আর গার্ড অব্ অনার পেলেন বুঝি সেই ঈভনিং জ্যাকেটের পয়সায় মর্গানেটিক টিপ্‌স্ দিয়ে?' টেটেন ইংরিজিতে এম-এ। লাতিন শব্দের ইঁটের থান মারে।

অজনদা বললে, 'সে সব দিন গেছে রে টেটেন, তুই জানিস নে। টিপ্‌স্ দিলে তোকে খাতির করলে করতেও পারে, কিন্তু না দিয়ে তুই যদি এম-এল এম-পি হবার ভাণ করতে পারিস অর্থাৎ ভি আই পি টি আই পি—'

মশাদা আলট্রা ডিমোক্রেট। বাধা দিয়ে বললে, 'এই ভি আই পি কথাটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিল জানেন, চাচা? লোকটা নিশ্চয়ই জন্মদাস ছিল। ভি আই পি যদি কেউ থাকে তবে সে মুটে, জুতো-বুরুশওলা—সরকারের এক পয়সা নেয় না, সরকারের গাড়ি মুফতে চড়ে না,—'

আমি বললুম, 'আমি টিপ্‌স্ দি নি। শোন।

পালের বলদ বিক্রি করে তো অ্যারকোচে চাপলুম। দিল্লী চিরতরে

ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে দিল্লীর খানদানী ইয়ারদোস্তরা গাড়িতে বিস্তর খাবার-দাবার তুলে দিলে। বিরয়ানী, মুরগী মুসল্লম থেকে মিঠা টুক্‌ড়া মোরব্বা ইস্তেক! চারটে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি। দুজন তো এলেন কানপুর অবধি। তাঁরা আবার দোস্তী পাকাতে ওস্তাদ। কোচের প্রায় সবাই জড়ো হল আমাদের কুপেতে। শুরু হল মুশাইরা, বয়েৎ-বাজি। তারপর নবাবী খানাপিনা। স্টুয়ার্ড সোডা সাপ্লাই করতে করতে কাহিল হয়ে গেল।

রাত বারোটার সময় যখন যে যার কোঠে ফিরে গেছেন, আমি একা, তখন দেখি স্টুয়ার্ড। পিছনে তারই দলের দু'তিনজন। ভাবলুম, লোকগুলো বিস্তর খেটেছে—এই বেলাই টিপস্‌টা দিয়ে দি। কিন্তু তার পূর্বেই সে ডবল সেলাম করে শুধালে, "হুজুর, আপ তো ডক্টর হৈ?" গোয়ানীজ টোয়ানীজ হবে—'ডক্টরই' বলেছিল। আমি না ভেবেই বললুম, "হ্যাঁ।" তখন বিস্তর কাঁচুমাচু হয়ে, এন্তের ঢোক গিলে, ঘাড়ের চুল ছিঁড়ে প্রায় ক্লীন শেভ করে বললে, "হুজুর যদি কিছু মনে না করেন—"

আমি বললুম, "কী আপদ! বলেই ফেলো না!"

বহু কষ্টে বোঝালে, তার মেটের ভয়ঙ্কর জ্বর, বেহদ্দ বেহুশ, এই যায় কি তেই যায়। হুজুরের যদি দয়া হয়, হুজুর মেহেরবান।

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি। বললুম, "বড়ী আফসোস্‌ কী বাৎ কিন্তু আমি কি করবো?"

এবারে সে তার সর্বশরীর বাং মাছের মত মোচড়াতে আরম্ভ করলে যেন জ্বরটা তারই! বললে, "আপনি তো স্যর, ডক্টর।"

তখন আমার কানে জল গেল। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আমি জ্বর সারাই কে বললে?"

লোকটা ভয় পেয়েছে। অথচ আপন কাজ উদ্ধার করতে চায় বলে মেলা তর্ক করে আমাকে চটাতেও চায় না। বললে, "এই তো রিজার্ভেশন কার্ডে লেখা রয়েছে, হুজুর।"

এ দুনিয়ায় 'আলী' নামটা বাঙলা দেশে 'কেষ্টা' নামটার মতই বিরল।

গুবলেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমার আপিস বার্থ রিজার্ভ করার সময় ডক্টরটি জুড়ে দিয়েছিলেন। সেইটেই এখন কাল হল।

আমি সবিনয় বললুম, "সে অন্য ডাক্তার।"

বোধ হয় ভুল করলুম। কারণ এর পর দেখি স্টুয়ার্ডের সাঙ্গোপাঙ্গরা তার পিছন থেকে মাসিকপত্রের উপন্যাসের মত 'ক্রমশ প্রকাশ্য' হচ্ছে। সক্কলেরই হাত জোড় করা। হুবহু মোগল পেন্টিংয়ের দরবারের মত! অবশ্য মুখের ভাব ;—আসামীর সনাক্তকরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, এইবারে সাক্ষীশাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ আরম্ভ হবে।

আমি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি অন্য ডক্টর। তারা তর্ক করতে চায় না, কিন্তু জানতে চায়, তবে কিসের? ডক্টর অব ফিলসফি এদের বোঝায় কি প্রকারে? শেষটায় বললুম, "দেমাগ সাফ করনেকা ডাকৃটর"—"অর্থাৎ মগজ সাফ করার ডাক্তার।' শুনেছি, দর্শন অধ্যয়ন করলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, অবশ্য আমার বিশ্বাস বিপরীত।'

রসা রোড থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত তাবৎ হাজরা রোড এ-কথায় আনন্দে সায় দিলে। কথায় বলে 'দশের মুখ খুদার তব্লা', কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে উল্লাস বোধ করলুম না। যাক্ গে।

"এই 'দেমাগ সাফ করাটা' গিলতে স্টুয়ার্ডগোষ্ঠীর সময় লেগেছিল। শেষটায় স্বয়ং স্টুয়ার্ডই হালে পানি পেল। ভয় পেয়ে বললে, "না, হুজুর, মেটের মাথা খারাপ নয়।"

ও হরি! এরা ভেবেছে, আমি পাগলের ডাক্তার।

টেটেনদি বললে, 'সাইকায়াট্রিস্ট্।'

আমি বললুম 'কচু। মেড্সিন না পড়েও ঐ কর্ম করা যায়। সেটা ওরা বুঝলে তো আমি বেঁচে যেতুম। তা নয়। ওরা ফিসফিস করছে, আর সব মেলা ব্যামো সারানোর পর আমি পাগল সারাতে মন দিয়েছি —ঐ কর্ম সব চেয়ে কঠিন বলে! পাগল সারাতে পারে, আর জ্বর সারাতে পারে না! হুঁঃ! 'হাতী' বানান করতে পারে আর 'পিপীলিকা' পারে না—হাতী কত বিরাট আর পিপীলিকা কত ছোট—ঐ গোছ যুক্তি।

কিংবা বলতে পারো, ছোট বিপদ এড়াতে গিয়ে পড়লুম বড় বিপদে। সেই যে কোন্ সুবুদ্ধিমান বৃষ্টি এড়াবার জন্য ডুব দিয়েছিল পুকুরে।

তা সে যাকগে। ওরা আমাকে বিধান ডাক্তার, মানুষের ডাক্তার, পাগলের ডাক্তার কুকুরের ডাক্তার, যা-খুশি ভাবুক, আমার তাতে থোড়াই এসে যায়।

কিন্তু ঐ বিধান ডাক্তার নিয়েই লাগল গোলমাল। ওরা ভেবেছে আমি বিধানবাবুর চেয়েও বড় ডাক্তার। কিছুটা আমায় শুনিয়ে, কিছুটা নিজেদের ভিতর তাদের মধ্যে যেন নিলাম ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমার দক্ষিণা কত! চৌষট্টি না কত থেকে আরম্ভ হয়েছিল শুনতে পাইনি, কিন্তু আমার চোখের সামনেই, দেখ তো না দেখ, দশ বিশ হাজারেও গিয়ে পৌঁচেছে। আর কত রকম যুক্তিই না একে অন্যকে দেখাচ্ছে। অ্যারকণ্ডিশন চড়ি, সে তো ডাল-ভাত। কটা বাক্স, প্যাটরা —সব তাদের মুখস্থ। দামী দামী ডাক্তারির মালপত্র ওদের ভিতরে। সব বিলায়তী, জর্মনি, আরো কত কি!

আমার চেহারা দেখে আমাকে উজবুক মনে হতে পারে, কিন্তু পাষণ্ডের মত চেহারা আমার নয়, সে-কথা আমার মা আমাকে বলেছে। তবে কেন এরা ভাবছে, আমি একটা আস্ত কসাই, মোটা টাকা না পেলে বরঞ্চ একটা লোককে মরতে দেখব, তবু কড়ে আঙুলটি তুলব না।

আমি বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ডাক্তারির কিছুই জানিনে, খামখা একটা লোককে কুচিকিৎসায় মারি কোন আক্কেলে?

ওরা চুপ করে যেভাবে আমার দিকে তাকালে তাতে মনে হল আমি যেন একটি পয়লা নম্বরের গোড়সে। তবে গোড়সে শুধু একটিমাত্র গাঁধীকে খুন করেছিল, আমি করি গণ্ডায় গণ্ডায়।

আমিও চুপ।

শেষটায় তারা শ্লথ মন্থরে পা চালাতে আরম্ভ করলে।

আমার মনে করুণার উদ্রেক হ'ল। আর ঐ করলুম ভুল। যুধিষ্ঠিরের মত খৃষ্ট কোন একটি পাপ করার ফলে যদি কখনো নরকদর্শনে আসেন

তবে তাঁকে ঐ একটি উপদেশ দেব, 'মহাশয়, আপনি করুণা করে ঐ করুণা করার উপদেশটি দেবেন না।'

ওদের বললুম, 'তা ওকে এলাহাবাদে নামিয়ে দাও না'—মনে মনে বললুম, পণ্ডিতজীরও নিশ্চয়ই গণ্ডাকয়েক অনারারি ডক্টরেট আছে।

এক লম্ফে সবাই আবার আমার দোরের সামনে। এককণ্ঠে সবাই বললে, 'এলাহাবাদ তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, হাওড়া পর্যন্ত তা হলে তো এর কোনো গতি নেই। তখন আরো মনে পড়ল, বছর তিনেক পূর্বে আমার ফ্লু হওয়াতে এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে এক শিশি ফ্লু টেবলেট দিয়ে যান; আমি ভালো করেই জানতুম, ফ্লু ওষুধে সারে না, তাই সে ওষুধ তেমনি পড়ে ছিল। দিল্লী ছাড়ার সময় আমার সময় ছিল না বলে চাকরকে বলেছিলুম, ঘরের তাবৎ মাল যেন প্যাক করে দেয়। সেই কারণেই দুনিয়ার যত আবর্জনায় ভর্তি দু' গণ্ডা বাক্সোপ্যাটরা! ঘাঁটবে কে, খুঁজে পাবেন কোন হনুমান?

তারই ইঙ্গিত দিয়ে করলুম দুই নম্বরের ভুল—যদিও আসলে সেইটেই পয়লানম্বরী ভুল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আটটা বাক্স করিডোরে সারি বেঁধে সাজানো হল—আমি বাধা দিতে না দিতেই। তখন নাচার হয়ে সেই শিশিটার বর্ণনা দিলুম।

পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি এক ভোরে সার্চ হয়েছিল। আমি সে রাত্রে তার সঙ্গে ছিলুম বলে স্বচক্ষে দেখেছি পুলিশ কি রকম চিরুনি চালায় টুথব্রাশের উপর—তার থেকে এটম্ বম্ বেরোয় কি না, সেই আশায়। মায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে যেতে পারত কি করে সার্চ চালাতে হয়।

আড্ডার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'বল দেখি ভাইরা সব, তিন বছরের প্রবাসে মানুষের কোন্ না দশ বিশটা ওষুধের শিশি জড় হয়। তারই এক-একটা বেরয় আর তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভাবখানা,—তবে না বলেছিলেন চাঁদ, তিনি ডাক্তার নন। আর ইংরিজি পড়তে জানে না বলে লাইটার ফ্লুইডকে ভাবে ওষুধ, ফেন্‌সি গঁদের

শিশিকে ভাবে ওষুধ, সেন্টের শিশিকে ভাবে ওষুধ—একমাত্র মদের শিশিকে ওষুধ ভাবে নি—রেস্তোরাঁকারে কাজ করে বলে।

ওষুধের শিশি তো আর রাসবিহারী বোস নন যে জাপানে পালিয়ে যাবেন। ধরা পড়লেন। বমালসুদ্ধ গ্রেফ্‌তার—'

অজন বললে, 'এই 'বমালসুদ্ধ' কথাটা কি ভুল নয়? 'ব' মানেই তো 'সুদ্ধ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইথ'। উইথ মাল গ্রেফতার। আবার সুদ্ধ কেন! হয় হবে 'বমাল গ্রেফতার' না হয় হবে 'মালসুদ্ধ গ্রেফতার'। যেমন বলি বহাল তবিয়তে' আছি, 'বহালসুদ্ধ তবিয়তে আছি' তো বলিনে।'

মশাদা বললেন, 'রবিঠাকুর ব্যবহার করেছেন।'

অজনদা চটে বললে, 'তিনি তো দক্ষিণ আমেরিকায় বসে কবিতায় লিখলেন, আকাশে সপ্তর্ষি উঠলো। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কি সপ্তর্ষি দেখা যায়? আরো কি যেন আছে? হ্যাঁ—'বেতসের বাঁশী'—বেতস মানে তো বেত। বেত দিয়ে বাঁশী হতে কখনো দেখেছিস?'

টেটনদি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েছে। বললে 'যত সব বেরসিক!'

বড়দা সদুপদেশ দিলেন, 'সে না হয় পণ্ডিত মশাইকে পরে শুধনো যাবে, কোনটা ঠিক। উপস্থিত তোদের বলে দিচ্ছি, রবিঠাকুরের সেন্টেনারি আসছে। এখন বছর দুই এসব কথা বলেছিস কি পাড়ার ছেলেরা মারবে।'

মুকুলদি উঠে চলে যাচ্ছে, দেখে সবাই হন্তদন্ত হয়ে বললে 'বলুন, চাচা, তারপর কি হল।' মুকুলদিকে কে না সমীহ করে। ভাঁড়ারের চাবি তার হাতে।

আমি বললুম, 'ওষুধটা বেরুলে পর আমি বললুম, "এরই দুটি গুলি খাইয়ে দাও।" মনে মনে বললুম, "এতে তার ভালো-মন্দ কিস্‌সুটি হবে না—হাওড়া গিয়ে যা হবার তাই হবে।"

'নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলুম। ভাবলুম, আপদ গেছে। ঐ করলুম আরেক ভুল।

পরদিন সকালে বর্ধমানে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার কূপের

সামনে একপাল লোক একসারি কাপড়ে ঢাকা ট্রে নিয়ে হাজির। ভাই, তোরা যদি থাকতি—রুটি-মাখন-মমলেট বাদ দে— ফ্রাঙ্কফুর্টার সসেজ, মালাবারের টিনের চিংড়ি, ইস্তেক মুসলমানী কাবাব পরোটা।'

আমার ভ্রূকুটিকুটিল নয়ন তারা লক্ষ্যই করলে না। সমস্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'সেরে গেছে, হুজুর, একদম সেরে গেছে।'

আমি বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। বললুম 'কে ?'

সবাই প্রথমটায় থ মেরে পরে বললে, 'ঐ যে মেট।' তারা যেভাবে তাকালে তাতে মনে হল ওরা যেন বলতে চায়, ডাক্তারগুলো কী বেদরদ চামার—রুগীর কি হল না হল থোড়াই পরোয়া করে—ইস্তেক কে রুগী; সেও ভুলে যায়।

স্টুয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সকালে উঠেই তিনখানা ডবল রুটি খেয়েছে। দু পট চা। আমরা বারণ করিনি। আপনি তো রয়েছেন। আর ভাবনা কি।"

আমি মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম।'

অজনটা পেটুক। বললে, 'তা বেশ। ব্রেকফাস্টটা ভালো করে খেয়ে নিলেই পারতেন !'

আমি বললুম, 'দেখ অজন, আস্ত একটা বুজরুক পেলি নাকি আমাকে—পেশাদার গুরু-মুর্শীদরা ঐ রকম ধাপ্পা মেরে খায়। আমাকে কি তাই ঠাওরালি ?' মশাদা বললে, চাচাকে কখন ব্রেকফাস্ট খেতে দেখেছিস—সেইটে হল আসল কারণ।'

টেটেন বললে, 'আপনি থামুন, চাচাকে আর চটাবেন না। বলুন, চাচা।'

আমি বললুম, ব্রেকফাস্ট খেলুম না দেখে ওরা ভড়কে গেল—অবশ্য চা দু' কাপ খেয়েছিলুম। ওরা নিঃশব্দে চলে গেল।

হাওড়া পৌঁছবার পূর্বে চীফ স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললুম, "এই নাও চায়ের এক টাকা, আর তোমাদের টিপ্‌স চার টাকা।"

স্টুয়ার্ড ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইল। তার পিছনে একটা অচেনা চেহারার লোক ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে—পরে জানলুম ঐ লোকটাই

মেট, আমাকে সেলাম জানাতে এসেছিল—তার পর ডুকরে বললে, আমরা গরীব আপনার ফীজ দিতে পারলুম না, আর আপনি উল্টে দিচ্ছেন বখ্‌শিশ্‌।"

আমি বিরক্ত হয়ে সব কটাকে বের করে দিয়ে কুপের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর তোরা তো দেখলি আমাকে প্ল্যাটফর্মে গার্ড অব অনার দিলে।'

ব'লে গুম হয়ে বসে রইলুম।

ঘণ্টুদা একটু মুরুব্বি ঢঙে কথা কয়। বললে, 'এতে আপনি অত চটছেন কেন? আপনার ওষুধেই সারুক আর নিজের থেকেই সারুক, আপনার মন খামখা চঞ্চল করছেন কেন?'

আমি উষ্মার সঙ্গে বললুম, তোদের মত আকাট নিরেট গবেট আমি ইহজন্মে, পূর্বজন্মে জন্মে-জন্মে কখনো দেখিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ওদের মুখের উপর কৃতজ্ঞতা মাখা ছিল বটে—যার উপর হক্ক অবশ্য আমার নেই—তার পিছনে ছিল লেখা স্নব। অর্থাৎ আমি গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিনে, সেটা এড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলতেও তৈরী—অথচ আমি যে হাত উপুড় করলেই ওদের পর্বত সেটা সপ্রমাণ হয়ে গেল। সোজা বাংলায় স্নব, ক্যাডও বলতে পারিস—

আমার কণ্ঠ তখন পর্দার পর পর্দা চড়েই যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি জনা পাঁচেক লোক আমাদের বাড়ির নেমপ্লেট পড়ছে। লীডার সেই ব্যাটা স্টুয়ার্ড! আমি আঁতকে উঠলুম। কিন্তু ঠিকানা পেল কি করে? ওঃ! লাগেজগুলোর উপর নাম ঠিকানা সাঁটা ছিল। অবশ্য বাড়ির নেম-প্লেটে আমার নাম নেই।

আমি বৈঠকখানায় গা ঢাকা দেবার পূর্বে বললুম, ঐ সব মালরা আসছে। ওদের একটু বুঝিয়ে দে না, ভাইরা সব, চাচা-জানরা আমার, যে আমি ডাক্তার নই! তোদের কথা তো বিশ্বাস করবে।'

* * *

আড়াল থেকে অনিচ্ছায় নিম্নলিখিত কথোপকথন কর্ণে প্রবেশ করল।

'এটা ডাক্তার সাহেব অমুকের বাড়ি?'

অঞ্জনের গলা : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'—ঐ ঢাউস বাড়ি আমার নয়।

'নেমপ্লেটে নাম না দেখে ভাবলুম, কি জানি—'

বাধা দিয়ে মশার গলা : 'আরে নাম থাকলে কি আর রক্ষে ছিল। ছিঁড়ে ফেলতো না দুনিয়ার যত সব রুগী টুকরো টুকরো করে।'

একাধিক গদগদ কণ্ঠস্বর : 'তা হুজুর আর কি বলবেন, আমরা কি জানিনে? এই মোতীর জ্বরটা বড্ডই পাজী। একবার ধরলে দশদিনের কমে—"

অন্য কণ্ঠ : "বিশদিনের কমে ছাড়ে না। আর ডাক্তার সায়েবের দুটি গুলিতেই—"

আরেক কণ্ঠ—বোধহয় স্টুয়ার্ডের—"কিছু যদি না মনে করেন, ওঁর ফাজ কত?"

অঞ্জনের টেনে-টেনে বলা : 'তা—তা—তা, দেড়, দুই—'

'দু শ? বাপ্।'

'হাজার—হাজার, শ নয়।'

নিশ্চুপ।

মশার গলা : 'অবশ্য যখন বাইরে যান ঐ যে, মাসখানেক আগে রামপুরের নবাবের ছেলে এসে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেল—স্পেশাল ট্রেনে—তখন ত্রিশ হাজার না কত—বল না ঘণ্টু, তুই তো সঙ্গে ছিলি—'

*   *   *

ভাবছি এ রকটা ছাড়ব।

॥ কর্নেল ॥

কুরফুর্স্টেন্-ডাম্ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানীতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা; ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব

ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্-ডামের গা ঘেঁসে উলাণ্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নূতনত্বের সন্ধানে—কলকাতার লোক যে রকম 'চাইনীজ' বা 'আমজদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন, অজর্মন বান্ধবীদের—মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে :—

তিন্তিড়ি পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রাস্তারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্ট্যু, ডাল হয় লেন্টিল সুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ্, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্ ফিশ্। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মত হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন। দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কান্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মত অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালীর অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হোসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ—তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত।

কারখানার চোঙার মত গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারী-ভারী একজোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনো বিরাজ করতে দেখেনি। বার্লিনের মত পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনো হ্যাট, টুপি ওভারকোট বা দস্তানা পরেন নি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরী নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টেন্‌-ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়ত বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা, রাস্তা ঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হাঁ, না, কিছু কবুল না করে কলকাতায় উড়িয়্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন।'

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু'মিনিট যেতে না যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরী চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানী দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওয়ানা দিতেন। 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধরনের কিছু বললে বা পরিচয়

করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন—যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে চাচার ঠিকানা থাকত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক; বুঝত, চাচা রাস্তার মাঝখানে নীরব কাব্য করেন বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হত।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছাড়াবার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেলস আর কি হতে পারে?

শ্রীধর মুখুয্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নূতন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করলে যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ছিল না।

চাচা বললেন, 'কি করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কি, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে না রে? বলতো, ধাপগুলো কি?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, কুলক্ষয় থেকে কুলধর্মনষ্ট, কুলধর্মনষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ' প্রফেসর বলছিল, "পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থবুদ্ধির লোক"?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সুয্যি রায়ের গলা বুদ্বুদের মত বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্ত নেই; সরকার কায়েতের

লে, পুরো চেন্‌টা বাৎলে দিসে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে
য়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, ঠিক বলেছ, রায়। তাহলে তুমি এক কাজ কর। তামার বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমত শকুট্ হয়ে বললেন, 'পানশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা ার কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা শ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি খবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে ানবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাক্য করে না একদম, ন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এদেশেও নিরম্বু-উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ, শোন। আমি এ-বিষয়ে ওয়াকীবহাল। পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল 'জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশীর ৌষ মাস।' ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেতন তখন হেশ্‌তে গিয়ে পৌঁচেছে—বেহেশ্‌তটা অবশ্যি বিদেশীদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচহাজার, কেউ দশহাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। াত্মহত্যার খবর তখন আর কোনো কাগজ ছাপাত না, নারী-হৃদয় কনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার্' চকলেট দিয়ে একসার ব্লণ্ড কেনা যেত, াচটাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশ' টাকায় কুরফুর্স্টেন্‌-ডামে বাড়ি, একটাকায় ্যাটের কমপ্লাট ওয়ার্কস।'

আড্ডার সবাই যেন সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনো যে সব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে কতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট। -সব জর্মন-পরিবারে বিদেশীরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের ায় সকলেই খেয়ে পরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, ঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষ-মাসাই হও না কেন তামাম মাসের ঘরভাড়া, াইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশী টাকার

তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুন গুন করে গান ধরলেন, দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমা সেই নতুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুর্দিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যাণ্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন্ ক্লারা ফন্ ব্রাখেল।'

আড্ডা এক গলায় শুধাল 'হকি-টিমের কাপ্তান ?'

চাচা বললেন, আমার জান-বাঁচানো-ওয়ালী। বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশী হই। প্রাশান ওবেস্টের (কর্নেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড় লোক ছিলেন, এখন 'উন্জর টেগ্লিশেস্ ব্রট্ গিব্উন্স হয়টে (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট মার্শাল করতে চায় ! শেষটায় যখন বললুম যে তুমি প্রাশান কারো কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হল। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তার বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ ; তুমি যে কোন উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তার বউ সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা ক'রো না, তিনি সব বোঝেন, জানেন।'

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্ ব্রাখেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম। এবং মনে মনে ভাবলুম বেশীর ভাগ ভারতীয়ই বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাকনা খানদানীরা থাকে কি কায়দায়।

ফন্ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যান নি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্নেল ডুটেন্হফারের বাড়ি পৌঁছলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগের দেখা থাকলে ফন্ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজি হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয় সে এক রাজপ্রাসাদ। এ বাড়িতে তো অন্ততঃ শ'খানেক লোকের থাকার কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা! সামনে প্রকাণ্ড লন। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টা বাজালুম। মিনিট তিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘণ্টা বাজাবো কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকাল বেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলায় চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দু'খানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখি, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায় ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এ-সব কিছু লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়; কিন্তু আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন তাঁর ঐ চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরিজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস্; 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মত তাকিয়েছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন (সুপ্রভাত)' আপনার আগমন শুভ হোক্। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্হফার।'

ভাগ্যিস ভারী মালপত্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হাতে আগেই সময়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এ রকম অবস্থায় চাকর দাসী কেউ না কেউ আসে কিন্তু কেউ যখন এ না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্‌হফারদের দুরবস্থা কতটা চরমে পৌঁচেছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজন খানেক হল পেরলুম—কোথাও একরত্তি ফার্নিচার নেই, দোর জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়েনি —জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায় দেয়ালের হুকের সারি, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানালার গায়ে-লাগানো পরদা ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজিঘরের ততখানি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস।

এ-বাড়িতে থাকব কি করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মন শেখা!

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সে বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মত খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মত। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে সে-খাটে শুয়ে আমারো সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বেন্‌কুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা; অন্য মাথায় গিন্নী, মাঝখানে আমি। এ অন্যকে কোনো জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গো মরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাঁড় প্রাশানের বাড়ি বটে; আড়ম্বর হীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জা

ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এ রকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা, টমাটোর মত লাল, অসুরের মত চেহারা, দুষমনের মত এই-মারি-কি-তেই-মারি অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা, কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে—শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেন নি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্ক মুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দু'খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় একটুকু খাঁজ খায় নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মত। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নিচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা, নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল! সে-চোখে যেন একটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ণ ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন। চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রাশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। বেকব্রাশ করা চকচকে প্লাটিনামরঙ চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোনখানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কি করে, তাও আবার শীতের দেশে ? সুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন এক টুকরো মাংস—শ্যামবাজারের মামুলি মটন-কট্‌লেটের সাইজ—দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধা-কপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না।

আহারে যত না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশী বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নূতন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে-সব তো কিছুই হল না—আমি আশাও করিনি—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতাদুরস্ত কৌতূহল, এ সব কোনো মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্নেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সকলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেক্সপীয়ারের কোন্ নাট্য আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে ?

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যোটে পড়েছেন ?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যোটে পড়ব ?'

আমি আনন্দের সঙ্গে, লক্ষসহস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম। মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক্ না প্রাশান রাজপুত কি রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মত, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার বললেন, ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি ?' বলে সেই যে ইংরিজি বলা বন্ধ করলেন তারপর আমি আর কখনো তাঁকে ইংরিজি বলতে শুনি নি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবেস্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্ত্রীকে, তারপর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এরকম 'বাও' করে বসবে কি করে জানব বলো। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনো একটা নূতন এটিকেট চালান সেই ভয়ে—যদিও আমার কোনো তাড়া ছিল না—আমি দু'মিনিট যেতে না যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হলুম—হিলে হিলে ক্লিকটা আর করলুম না, জুতোর হিল্ রবরের ছিল বলে।

চারটের সময় কফি খেতে এসে দেখি হের ওবেস্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্ণে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম. বাব্বা ইনি পওহারী বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন।

ডিনারে ওবেস্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ্ আর এক কাপ চা—তাও আর পাঁচজন জর্মনের মত—বিনদুধে!'

চাচা থামলেন। তারপর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন,

'এবমুক্তো হৃষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত।'

তারপর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, আমি নিদ্রা জয় করিনি, নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্‌সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না হয়েও 'যা নিশা সর্বভূতানাং' তার বেশীরভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে!

দেরীতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বম্‌শেল্ ক্লিক্ করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম, 'হিন্দুস্থানীকী তমিজ ভী দেখ লীজীয়ে।'

ওবেস্টকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কী অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন,

'না তো।' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দশটায় গ্যোটেপাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যোটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনো পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরী হোক আর না হোক ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

মিলিটারি কায়দায় লেখা পড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি; গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, পাল্লা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরী না থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবনতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয়—এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত—তাহলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না; আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘণ্টা কেশেছি, ক্লাশ কামাই যায় নি, হিণ্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায় নি; একটি বৎসর একটানা গ্যোটে, আবার গ্যোটে এবং পুনরপি গ্যোটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসীকে ঘায়েল করা যায়।

অথচ পড়ানোর কায়দাটা নাসিকে ভটচায্যি। গ্যোটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস; গ্যোটের সঙ্গে বেটোফোনের দেখা হয়েছিল কার্লস্‌বাডে—সেই খেই ধরে বেটোফোনের সঙ্গীত, বাগনার তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ; গ্যোটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভালো না মন্দ সে সব বিচার, এক কথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যোটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সব কিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের মোহ বোধহয় আমার এখনো কাটেনি; আমি এখনো বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়—যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যোটে আবৃত্তি করতেন—তাহলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু'ঘণ্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনো একটা কথাও বলেন নি। কেন তিনি মিলটারি ছাড়লেন, লুডেনডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নূতন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হত), পেন্সন্ কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না করে পারিবারিক তৈলাঙ্কণ তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না,—এ-সব কথা বাদ দাও, একদিনের তরে না ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনিনি প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দু'বার আড়াইবার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে লেম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছি—মদ না সিগরেট না, কফি না, বার্লিনের মেরুযুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহসঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দম্ভহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ, গুড়াকেশ—সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে, আমি নিজের অজানায় তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যে দস্তানা, অভারকোট, টাই কলার ছাড়লুম, আজো তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি নে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি!'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবেস্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার

উপর ছেলেবেলায় দু'হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে শ্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দুহস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাই নি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তার-ই প্রকাশ দিতে হের ওবেস্ট জাতিভেদের ইতিহাস, তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলো কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন—অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রান্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, বৈজ্ঞানিক পরশ পাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব সেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যে সব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্য-বিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কি বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না হয়! প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে না, তার দাবী শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে, সে-বিশেষত্বটুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না করে তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু অন্তত পক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবের্স্ট তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না হয়।

নীটশের সুপারম্যান?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রাশান আদর্শ হবে ত্যাগের ভিতর দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে, ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা! সেবা করার

জন্য যদি দরকার হয় তবে যে-সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য বিনাশ ?

হের ওবের্স্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন ? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোক-সেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরেই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবের্স্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু, বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণবিসর্জন, এও যেন আমার কাছে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন্ কোন্ জায়গায় বাধছে হের ওবের্স্টের কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ্য করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কি হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনানিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে যেখানে সূচ্যগ্র ঢোকাবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরো লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র রক্তসংমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না; আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হচ্ছে, "সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার।"

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে হিল-ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল ?

হের ওবের্স্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি,

পৎস্‌দাম পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরোনো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্তমত পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবের্স্ট বললেন, না বনাই ভালো। এ রকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোন সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মন নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না একদিন আলোচনা করে। হের ওবের্স্টকে কখনো আলোচনায় সে দিকটা মাড়াতে দেখিনি।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্পকাহিনী বলতুম। হের ওবের্স্টের তুলনায় যদিও তার সঙ্গে দেখা হত কম, তবু তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশী। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবের্স্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না জেনে হয়ত আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—তাই এ-প্রশ্ন শুধালুম।'

ফ্রাউ ওবের্স্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমুর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনো ছিল যে এ সব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রাশানরা হয়ত তখনো হিল্ ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে? সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারি পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশী?

তাই হের ওবেস্টের পড়াশুনোরও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে আগুন না জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজব হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশী মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকিবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিন পুরো পাকা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনেরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না ঘুমুলেও চলে—যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন

অনেকটা সেরে গিয়েছে—কাঠের পুতুলের মত খট খট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো নেটিব, কালা আদমী। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটা হল যে হের ওবেস্টের হৃদয় বলে যদি কোনো রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশানপর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। চেহারাটি ভারী সুন্দর, হুবহু হের ওবেস্টের মত। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে, তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিকেটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবেস্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন,—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোস খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমী হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কি বললে বুঝতে পারলুম না।

হের ওবেস্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আর বার, শেষবারের মত বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলুম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে চললুম। করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, দেখি, হের ওবেস্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে

দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায়। তখনো কাঁদছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান হাতে হের ওবেস্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম;—

'আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না।

আপনার বাড়ি পেতে কোনো কষ্ট হবে না জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবেস্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর নাই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকাল বেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবেস্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করিনি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল— সকলের হয়ে—'কিন্তু মেয়েটির দোষ কি ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবেস্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসর খানেক পরে। সেখানে শুনলুম তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসী।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কি ছিল রে? বর্ণসঙ্কর ফঙ্কর আবোল-তাবোল কথা? বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবেস্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙক্তেয় করলেন।

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়! আমাকে না তাড়ালে হয়ত তিনি আরও বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনো পেয়িং গেস্ট নিতে রাজী হন নি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরো একটি পদবী থাকা উচিত। কি বলো গোঁসাই?'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ, প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবলমার্চ করা দেখিয়ে দি।'

॥ নবাব-জাদী ॥

'বিশ্বাস!'

'জী' হুজুর?'

'কি হবে?'

'কী আর হবে।'

ছ বছর বয়স থেকে এই নবাব-বাড়ি দেখে আসছি। সকালবেলা বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরতুম, নবাব-বাড়ির পুব দিক দিয়ে। বিরাট পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতুম কী স্বচ্ছ, কাক-চক্ষু জল। এদেশে পুকুরমাত্রই পানা-ভরা, কিন্তু এ-পুকুরে কোথাও এতটুকুমাত্র কোনো ভেসে-যাওয়া শুকনো পাতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর দেখতুম ঐ দূরে, ওপারে, কারা যেন সানবাঁধানো ঘাটে নাইছে, কথাবার্তা বলছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এপারে কোনো শব্দ আসছে না। আর পাড়ে পাড়ে অসংখ্য জারুল গাছ সর্বাঙ্গ বেগনি ফুল পরে নিয়ে দুলছে।

সবসুদ্ধ সাতটা পুকুর ছিল নবাব-বাড়ি ঘিরে। পুবের পুকুরের পাড় হয়ে আমরা উত্তরের পুকুরে পৌঁছতুম। করে করে বাড়িসুদ্ধ সব কটা পুকুর পরিক্রমা করে আপন বাড়িতে যখন পৌঁছতুম তখন আমি রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিন্তু আমার কৌতূহলের ক্লান্তি ছিল না। ঐ যে পুকুর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে বিরাট বিরাট চণ্ডীমণ্ডপপারা খড়ের আটচালা, চারচালা, দুচালা ওখানে কি হচ্ছে? আমরা থাকি ছোট বাড়িতে—মাত্র চারখানা ঘর এবং তাদের সব ক'খানাই এদের একটা ঘরে ঢুকে যেতে পারে। আমাদের জীবন আর ওদের জীবনের ধরন যে এক হতে পারে না সে বিষয়ে আমার মনে একটা আবছা-আবছা ধারণা ছিল। দুই পুকুরের

াঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া রাস্তা। শেষ হয়েছে বড় বৈঠকখানার ামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ল্যাণ্ডো গাড়ি। ঘোড়া কাঁকরের রাস্তায় য পা ঠুকছে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে। গাড়ির গা, ঘাড়ার গা থেকে যেন সকালের রোদ ঠিকরে পড়ছে; সেটা দেখতে পাচ্ছি মারো স্পষ্ট। আর পিছনে দেখছি, আবছা-আবছা বৈঠকখানার বারান্দায় ারা সব হাঁটাহাঁটি নড়াচড়া করছে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতুম, 'এসব কি? এখানে থাকে কারা?'

বাবা ছিলেন কট্টর। শুধু যে আপন ধর্মে অবিচল বিশ্বাস তাই নয়, ার মতে সংসারে মাত্র দুটি রঙ। কালো আর সাদা। মিশমিশে ালো আর ধবধবে সাদা। পাপ পাপ, পুণ্য পুণ্য! পাপী যতই বোঝাবার চষ্টা করুক না কেন, কোন্ নিদারুণ দায়ে পড়ে সে ঐ কর্ম করেছে বাবার চানে সেটা প্রবেশ করতো না। ভালো মন্দয় মিলিয়ে মানুষ গড়া। এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মনের এল্‌বামে কোনো হাফটোন্ ছবি ঢুকতে পারতো না। এসব অবশ্য আমি বড় হয়ে পরে বুঝতে পেরেছিলুম।

নবাব-বাড়ির বিলাস-ব্যসন, হয়তো বা অনাচার পাপাচারের খবরও তাঁর কানে গিয়ে পৌচেছিল। 'পৌচেছিল' ইচ্ছে করেই বলছি. 'প্রবেশ করেনি' নিশ্চয়ই, কারণ কোনো রকমের পাপাচারের কথা তাঁর সামনে কেউ তুলতে সাহস পেত না, এবং যদি বা মুরুব্বিদের পাতলা কোন একজন একটুখানি ফড়ুক্কিপনার কথা তুলতে চাইতেন, বাবা অমনি, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে হয়েছে,' বলে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা পাড়তেন।

কাজেই নবাব-বাড়ির ব্যাপারে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি পাইনি। বাবার গলা থেকে যে একটা গ-র্-র্-র্ জাতীয় শব্দ তখন বেরতো তার মানে আমি জানতুম—এসব বাজে প্রশ্ন আমায় শুধোসনি।

তার বছরখানেক পরে বাবা গেছেন মফঃস্বলে। আমি সেই সুযোগে সোজা রওয়ানা দিয়েছি নবাব-বাড়ি পানে। রাস্তায় একা চলা অভ্যাস নেই, তার উপর দুই পুকুরের মাঝখানের পথের দু'ধারের নূতন নূতন ফুলের বাহার দেখে আমি তন্ময়, এমন সময় 'ধর ধর, গেল গেল' চীৎকার

এবং চোখের দু'হাত সামনে দেখতে পেলুম জুড়ি গাড়ির দুই বিরাট ঘোড়া হঠাৎ থামাতে গিয়ে সামনের দু' জোড়া পা আকাশের দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর আর জ্ঞান ছিল না।

যখন চৈতন্য হল তখন প্রথমেই নাকে গেল গোলাপজলের মিষ্টি মোলায়েম গন্ধ। চোখ মেলে দেখি, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মুখ—মেয়েদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার বয়েস তখনো আমার হয়নি কিন্তু তবু লক্ষ্য করেছিলুম তাদের মুখে ভীতি আর কৌতূহল। এরা অন্দরমহলের পর্দানশীন কিশোরী তরুণী। বাইরের অনাত্মীয় ছেলে কখনো দেখেনি।

আমার কাছে সে ঘর মায়াপুরী সদৃশ মনে হয়েছিল। কত ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, ফানুস, আমার পরিচিত মক্কা মদীনার ছবি—কিন্তু কী বিরাট বড়, আর কতো সুন্দর সোনালী চওড়া ফ্রেমে বাঁধা—নীল মখমলের উপর সোনালী হরফে লেখা হজরৎ বড় পীর মুঈন উদ্-দীন চিশতীর নাম, আরো কত কী। আর বিছানাটাই বা কী মজার! একটু নড়তে গেলেই নীচের দিকে নেবে যায়।

মেয়েগুলি যেন এক একটি পরী। তাদের বুড়ী মা-মাসীরাও যেন বুড়ী পরী। তারাও কী সুন্দর? উপরে টানাপাখা বেদম চলছে, তৎসত্ত্বেও গোটা তিনেক মেয়ে হাতপাখা দিয়ে অনবরত আমাকে পাখা করে যাচ্ছে আর আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

পিছনে দাসীদের কলগুঞ্জরনের মাঝখানে শুনতে পেলুম, পীরের ছেলে', মুন্সীদের ব্যাটা' এই সব বলে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

হঠাৎ এরা সব চলে গেল। ডাক্তার সেনগুপ্ত এসেছেন।

আমার কিছুই হয়নি। হঠাৎ বিকটদর্শন জোড়া-ঘোড়া দেখে ভিরমি গিয়েছিলুম। আমার পরিচয় পেতে এদের কণামাত্র সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, 'কিছু হয়নি। আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

বারান্দা থেকে গলা শোনা গেল: 'ল্যাণ্ডোয় করে নিয়ে যায় না যেন। হয়তো ঐ গাড়ি দেখে পীরের ছেলে ভয় পাবে। পাল্কি-গাড়িতে করে। আর বাতাসার মাকে বল সঙ্গে যেতে।' বাতাসের মার সঙ্গে অনেক

হালুয়া মোরব্বাও দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির ভিতর লক্ষ্য করেছিলুম ছোট্ট সুন্দর একটি আয়না, আর দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ফুলদানিতে কালো গোলাপ। মায়ের সঙ্গে যে ছ্যাকড়া-গাড়িতে করে মামাবাড়ি যাই এ তো সে-রকম নয়!

নবাব-বাড়ির সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

*   *   *

বাবা ট্রান্সফার হওয়াতে আমরা অন্য শহরে চলে গেলুম।

তারপর ঐ শহরের কাজল নদী দিয়ে কত জলই বয়ে গিয়েছে! নদীর উপর লোহার পোল হয়েছে। দূরের রেলগাড়ি পঁচিশ বছর ধরে চলতে চলতে নদীর ওপারে এসে ইস্টিশেন বানিয়ে এপারেরও জলুস বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই গাড়ি ধরেই একদিন পৌঁছলুম আবার সেই শহরে। স্টেশনে আমার অফিসের হেড্‌ক্লার্ক, একাউনটেণ্ট উপস্থিত। বললে, ভালো বাড়িই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সরকার এত ঘন ঘন আমায় বদলি করেছে যে, এখন আর ওসব বাবদে আমার কোনো ঔৎসুক্য বা কৌতূহল নেই।

একদা এ শহরের রাস্তার প্রতিটি গর্ত আমার মুখস্থ ছিল। সাইকেলের রডে বসিয়ে বড়দা আমাকে নিয়ে শহরে চক্কর লাগাতো। প্রতি গর্তে খেতুম ঝাঁকুনি। আজ সে রাস্তাগুলো ফিটফাট। গাঁধীজী আসেন, জিন্না সাহেব আসেন—লাটসায়েব আগেও আসতেন, এখন আসেন ঘনঘন।

অনেক পাকা বাড়ি হয়েছে। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে প্রায় সব পাকা বাড়ি ধূলিসাৎ হওয়াতে আমার ছেলেবেলা পর্যন্ত অতি অল্প লোকই পাকা বাড়ি বানাতে সাহস করতো। এতদিনে সে স্মৃতিও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হেথা হোথা অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়ার গাছ শহরে এক নূতন বাহারের সৃষ্টি করেছে। হলে কি হয় ফরাসীতে বলে, 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ—'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা আগের মত দেখায়'—এখানকার পথের পাশের সবুজ আর কাঁকরের রাস্তার লালে এমন দুটো শেড আছে যেগুলো শহরের দুরঙা জাতীয় নিশান। হাত দেয় কার সাধ্য!

তবু কেন জানিনে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো শহরের ছবি আমার মনে কোনো আনন্দ সঞ্চার করতে পারলো না। চোখ দুটো বন্ধ করলুম।

ট্যাক্সি থামলো। আমি চোখ মেলে অবাক।

সেই ছেলেবেলায় যে বাড়িতে আমরা থাকতুম, আমার আপিসের লোক ঠিক সেই বাড়িটাই আমার জন্য ভাড়া নিয়েছে। তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকু যে দক্ষিণমুখো টিনের ছাতওলা সেই আসল বড় ঘরটা আর নেই; তার বদলে একখানা ছিমছাম দোতলা বিল্ডিং—সবুজ খড়খড়িওলা জানালা আর বাড়িটার রঙ ফিকে আসমানী।

স্মৃতির গামছাটা কে যেন নিঙড়ে নিয়ে চার ফোঁটা চোখের জল বের করে দিলে।

আপিসের লোকজন বিচক্ষণ। আমাকে আমার পুরনো স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল।

রাস্তার দিকে মুখ করে ডেকচেয়ারে শুয়ে তাকিয়ে আছি রাস্তার ওপারের সেই প্রাচীন দিনের আম জাম বাঁশ বেতে ঘেরা বাড়িটার সুপুরিগাছের ডগার দিকে, আর শুনছি ঘুঘুর সেই পুরনো ডাক, 'কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো; কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো।'

সিগারেট বের করতে গিয়ে প্রথমটায় হাত পকেটেই থমকে গিয়েছিল—হঠাৎ মনে পড়েছিল, মুরুব্বীদের কেউ যদি দেখে ফেলেন! তখন মনে পড়লো, হায়! এ শহরে আমার আর কেউ মুরুব্বী নেই। কোথায় না কারু তোয়াক্কা না করে ভস্ ভস্ করে সগর্বে সিগারেট খেতে পাবার আনন্দটা মন ভরে দেবে—বীনু যে রকম প্রথম রেলগাড়িতে চড়ে সঙ্গে শ্বশুর-ভাসুর কেউ নেই বলে পুলকিত হয়েছিল—আমার হল উল্টোটা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দীঘির-পাড় মহল্লার ওসমান চাচা মেজ চোটপাট করতেন সত্য কিন্তু তাঁর বাগানের লিচু খাওয়ার জন্য খবরও পাঠাতেন সেও তো সত্য। তাঁর হাড়-কিপটে জামাই বাগানের তাবৎ লিচু পাইকারকে বিক্রি করার ইঙ্গিত দিলে পর চাচা নাকি জামাইকে—আপন জামাইকে—খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন। আজ চাচা যেখানে

সেখানে আল্লা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে মাইলকে মাইল জুড়ে লিচুবন তৈরি করে দিয়েছেন।

সেই ছাতা ল্যাম্পটা আর নেই। সন্ধ্যে হতে না হতে বেয়ারা এসে ফটফট করে গোটা তিনেক বিজলি বাতি অলস অবহেলায় জ্বালিয়ে দিলে। মনে পড়লো, সেই প্রাচীন ছাতা ল্যাম্পটা প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের কাছে কী আদরটাই না পেত।

গেটের কাছে দেখি দুজন লোক আমার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কি যেন আলোচনা করছে। শেষটায় দেখি সাহস সঞ্চয় করে দুজনাই কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। আমিও এগিয়ে গেলুম। চলার ধরন থেকেই বুঝতে পেরেছি এরা কারা।

আহমদ আলী সুন্দর চাপদাড়ি রেখেছে, আর বিধু চক্রবর্তী সেই প্রাচীন দিনের সাজে—ধুতি-পাঞ্জাবি-উড়ুনি। হাতে সেই রেলি ব্রাদার্সের সনাতন বাঁশের ডাঁটের ছাতা।

আহমদ আলী এগিয়ে এসে বললে, 'পরিচয় দিতে হবে নাকি? পাঠশালে পাশে বসতুম।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, 'সে তো হতে পারে না আহ্মদ সাহেব; আমার পাশে এ রকম দাড়িওলা কেউ বসতো না।'

বিধু অল্পেতেই হাসতো—সেই ছেলেবেলায়ও। আহ্মদ আলিকে বললে, 'দেখলি? কিরকম একখানা মাল ছাড়লে। এবার বলবে, অন্য পাশে ও রকম নেয়াপাতি ভুঁড়ি নিয়ে কেউ বসতো না"।' বলেই তার নেয়াপাতি ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসি আর থামাতে চায় না।

দুজনাকে পরম সমাদরে বারান্দায় বসালুম।

গড়গড়ায় টান দিয়ে আহমদ আলী বললে, 'জানিস, বিধু, এ বারান্দায় বসে গড়গড়ায় টান দিতে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হয়। তবু না হয় মেরে কেটে সিগারেটটা বোঝা যায়। বিপাকে ওটাকে পকেটে পুরে নাক টিপেও মারা যায়।' বিধু বললে, 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কুঞ্জ খুঁজতেন, কিংবা যেতেন গোপীসহ যমুনার অতল জলে—তাঁর পর্যন্ত মুরুব্বীর ভয় ছিল।' তারপর, রাধামাধব, 'রাধামাধব' বলে বার দুত্তিন হুংকার ছাড়লে।

আমি চোখ টিপতে আহমদ আলী বললে, 'দেখ বিধে, বয়েস হয়েছে, এবারে ভণ্ডামি ছাড। কেষ্টঠাকুর অনেক লীলাখেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐ ভণ্ডামিটা করেননি কক্‌খনো।'

বিধু পাষণ্ড। আমাদের ধর্ম্মকথায় কান দিলে না।

পুরানো দিনের অনেক কথাবার্তা হল। ওঠবার সময় বিধু কিঞ্চিৎ কিন্তু কিন্তু করে পকেট থেকে একটা বড় সাইজের পানের ডিবে বের করে বললে, 'রাত্তিরে খাস। বউ দিয়েছে। সন্দেশ। তোর তো—'

*　　　*　　　*

পুরানো হলেও নূতন বাড়ি। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। কত রকম স্বপ্ন যে তালগোল পাকিয়ে আমাকে বিব্রত করে গেলো তার ইয়ত্তা নেই। শুধু একটা স্বপ্ন দেখলুম খুব পরিষ্কার। ঐ বাড়িতে আমার একটি ছোট ভাই মারা যায়। স্বপ্নে দেখলুম, তাকে সাইক্লের রডে বসিয়ে বাড়ির লনে পাক খাচ্ছি আর সে খলখল করে হাসছে।

সেই শেষ স্বপ্ন। ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে। শীতকাল। র‍্যাপারটা জড়িয়ে বারান্দায় বসলুম। কে যায় ঐ রাস্তা দিয়ে হনহন করে? বিধু না? 'আরে ও বিধুশেখর, ও চক্কোত্তী। থামই না।'

ব্রজসুন্দরীকে স্মরণ করতে করতে বিধু বারান্দায় উঠে বললে, 'অবাক করলি। তুই না বেলা দশটার আগে কখনো বিছানা ছাড়িসনে। জীবনে কখনো ফজরের নামাজ পড়েছিস? তা ভাই, আমি চললুম। দেরি হয়ে গিয়েছে। আহমদ আলী বসে আছে। ওকে নিয়ে মর্ণিং ওয়াকে যাই। চল না। না না। তোকে আর ড্রেস বদলাতে হবে না। রাস্তায় লোকজন নেই।'

আমি বললুম, 'সে কি রে? বাবার সঙ্গে যখন ভোরে বেড়াতে বেরতুম তখন তো আমাদের এই অজ মহল্লাতেই বুড়া-ছোঁড়ায় গিসগিস করতো।'

বিধু বললে, সে সব দিন গেছে। এখনকার লেটেস্ট্ থিয়োরি হচ্ছে, ব্রাহ্মমুহূর্তে যে লক্ষ্মীছাড়া জড়নিদ্রা আসে সেইটেই নাকি সঞ্জীবনী নিদ্রা। যত সব হাড় আলসের দল!'

ঘন কুয়াশা। লাল কাঁকর-ঢালা এক ফালি আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে তিন জনায় চলেছি। রাস্তার দু'দিকের খালে হয় কচুরিপানা, নয় দুনিয়ার যত লতাপাতা, কচুঘেঁচু আর ঢেঁকিশাকের মত মাথাবাঁকনো কি সব ফার্ন যার নাম দেওয়ার প্রয়োজন কেউ কখনো অনুভব করেনি। এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে কোনো একটু সবুজ-কিছু গজায়নি। এই শীতকালেও। শিউড়ি বিষ্টুপুরের লোক কল্পনাও করতে পারবে না। ওদিকে আবার ওদের তাল, খেজুর, নারেকোল গাছ এখানে খুঁজে বের করতে হয়। বদলে রয়েছে, রাস্তার দু'পাশে সুপুরির এভিনিউ। তাদের সাদা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা হিম—যেন লেসে গাঁথা মুক্তোর কাজ।

হঠাৎ ফাঁকায় বেরলুম। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ মন্ত্রবলে যেন কুয়াশা অন্তর্ধান করল। রোদ্দুরটা যেন সন্ধ্যেবেলার কনে-দেখায় আলোর মর্নিং এডিশন। বাঁ দিকে নজর যেতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালুম, এবং সেটা এমনই আচমকা যে আহমদ আলী বিধু চক্কো একসঙ্গে শুধলো 'কি হল ?'

আমি নিস্পন্দ, নির্বাক।

এই সেই নবাব-বাড়ি ?

পানায় পানায় ছয়লাপ হয়ে সব-কটা পুকুর এক হয়ে গিয়েছে। জারুল কৃষ্ণচূড়ার এভিনিউ কে যেন সমূলে উৎপাটন করে নিয়ে চলে গিয়েছে। এখন সেখানে যে আশসেওড়া, আকন্দের ঝোপঝাড় হয়েছে তারা যেন পুকুরগুলোর কচুরিপানার সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাড়িগুলোর দিকে চোখ যেতে দেখি, কতকগুলো কাত, কতকগুলোর গোটা দুই চাল উড়ে গিয়ে বেরিয়ে গেছে বাঁশের কাঠামোর পাঁজর, তার উপর বসে আছে সারি সারি পায়রা না ফিঙে ঠাহর করা গেল না, কোথাও বা বিশ্রী নোংরা জামধরা কেরোসিনের টিন দিয়ে চালগুলো মেরামতি চেষ্টা করা হয়েছে, একটা ঘরের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ঝড়ে উপড়ে-পড়া একটা আস্ত গাছ—সেটা সরাবার জন্য কারো বোধ হয় প্রয়োজন বোধ হয়নি—আর এখানে সর্বত্র জমে আছে আবর্জনারস্তূপ, ঝোপ-ঝাড়ে ভরতি তামাম বাড়িটা। এবং সবচেয়ে মর্মন্তুদ মনে হল, আনাড়ি হাতের একটি আধমরা আধফালি টমাটো খেত দেখে—এই দৈন্য,

অবহেলা, লক্ষ্মীছাড়া পরিবেশের মধ্যে কে যেন অনিচ্ছায় অর্ধাবশ হয়ে আধখ্যাচড়া চেষ্টা দিয়েছে একমুঠো খাদ্য সংস্থান করতে। এলোপাতাড়ি কঞ্চির বেড়ার মাঝখান দিয়ে সেখানে একটা ছাগল ঢুকছে।

বিধু বললে, 'কি রে, জ্যান্ত ভূত দেখলি নাকি? আমাদের দেখিয়ে দেনা।'

আমি ততক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। বললুম, 'কিচ্ছু দেখছিস না?'

'না তো।'

বুঝলুম নবাব-বাড়ির এ পরিবর্তন তো আর এক দিনে হয়নি যে এরা যারা পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরে এখানে বেড়াতে আসছে তারা লক্ষ্য করবে। তাই হেঁয়ালী বাদ দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলুম, 'নবাববাড়ির এ-অবস্থা হল কি করে?'

আহমদ আলী যদিও ঘড়ি ঘাড় বিধুর মত সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে না তবু দেখলুম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছে তারই। বললে, 'আল্লা যাকে দিয়ে যা করান। কিন্তু ধনদৌলত যায় কি করে সেটা তুই বহু বৎসর শহরে কাটিয়ে এসে আমাদের শুধোচ্ছিস! সেখানে তো শুনেছি, আজ রাজা কাল ফকীর। নিত্যি নিত্যি এবং গণ্ডায় গণ্ডায়। এখানে সব-কিছুই চলে ধীরে ধীরে, তাই ধনী হতে সময় লাগে, আর গরীব হতেও সময় লাগে।'

বিধু দেখলুম, একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আমার মন তখনো নবাব-বাড়িটার ঐ হতশ্রী ছবিটা গ্রহণ করতে পারছে না। বিধু বললে, 'চল, ঐ টিলাটার উপরে। বাবু সেখানে চা পান করেন'—বাবু অর্থাৎ আহমদ আলী।

টিলার উপর ছোট্ট একটি দেউল, কিন্তু বিগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো চিতাভস্মের স্মৃতি-মন্দির। দেউলের কোলে একটি ছোট ছত্রী। তারি উপরে বসে আহম্মদ আলী ঝোলা থেকে চায়ের ফ্লাস্ক বের করলো। বিধুর জন্য লেবু।

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে আহমদ আলী বললে, 'বিধু বলুক। ওর মা বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে।'

আমি বললুম, 'বিশ্বাসরা তো কায়েত হয়।'

বিধু বললে, 'হাতী হয়। বামুন হয়, কায়েত হয়, নমশূদ্র হয়, ডোম-চাঁড়াল ভী হয়। এই তো খবর রাখিস হিন্দুদের। আর আমরা মরি তোদের খবর নিয়ে নিয়ে। ওদিকে আবার গলাগলি, ভাই ভাই! যত সব!'

আমি বললুম, কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় যে আবার হিন্দুরা মুসলমানদের কোনো-কিছু জানে না, ওদিকে মুসলমানরা মনোরথ দ্বিতীয় থেকে আরম্ভ করে রটন্তী পূজো পর্যন্ত ওকিবহাল। তা সে যাকগে।'

বিধু বলাতে আবছা আবছা মনে পড়লো, তার মামার বংশের বিশ্বাসরা অনেক পুরুষ ধরে নবাব-বাড়ির নায়েব।

বিধু কোথায় আরম্ভ করবে, ঠিক যেন বুঝতে পারছিল না। শেষটায় বললে, 'মা আর কি বলবে? জ্যাঠতুতো ভাই, অথচ বয়েসে প্রায় বাপের সমান। তদুপরি গম্ভীর। তদুপরি বছর পঁচিশ পূর্বে যখন পড়তা বিগড়োতে আরম্ভ করলো সেই থেকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাড়ি ফেরেন দুপুর রাতে চোরের মত, বেরিয়ে যান ভোরবেলা চোরের মত। মামী নেই, ছেলেপুলে নেই হুনো দেবে কে?'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ হল কী করে?'

বিধু বললে, 'সে আমি জানি। আমাদের দেশে তখনো ব্যাঙ্ক কাকে বলে লোকে জানতো না।

শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে গোয়ালন্দ স্টীমারে কে নাকি নবাব সায়েবকে বোঝালে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সুদ দেয়। এমনিতে কেউ নবাব সায়েবকে লগ্নির কারবার করতে বললে তিনি নিশ্চয়ই তাকে হাণ্টার নিয়ে তাড়া করতেন, কিন্তু কোথায় কোন্ কলকাতায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেনাগালে কাগজ-কলমেই সব-কিছু হয়—ওতে আর আপত্তি কি? কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

ব্যাঙ্ক শেখালে, শেয়ার কিনলে আরো বেশী লাভ। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

নবাব সায়েব শিখলেন, চায়ের বাগান মুনাফা করে ব্যাঙ্কের

শেয়ারহোল্ডারকে তারই কিছুটা দেয়; অতএব করো চায়ের বাগান। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

মামার জীবন-দর্শন বড় সরল। জমিদারের ব্যাটা তুমি জমিদারি করবে। বিলাস করবে, সমঝে-বুঝে ব্যসনও করতে পারো এবং তার পরও, যদিস্যাৎ, নিতান্তই কিছু বেঁচে যায় তবে তাই দিয়ে কিনবে নূতন জমিদারি। কাছে-পিঠে হল ভালোই, দূর-দরাজে হলেও আপত্তি নেই। মামাকে খুশী করার জন্যই যেন নবাব সায়েব টাকা দিয়ে তাঁর ভাগ্নেকে পাঠালেন মালয় না বার্মায় কোথায় যেন—ওখানে সস্তায় বড় বড় মহল বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে চা-বাগানে নবাব খেলেন মার।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি?'

বিধু বললে, 'একদম। কিন্তু তুই ঠিকই আশ্চর্য হয়েছিস। নেটিভরা তখন সবে চায়ের কারবারে ঢুকেছে। ধুলোমুঠো সোনামুঠো হচ্ছে, অথচ নবাব খেলেন মার। মামা নাকি বলেছিল, নবাবের ব্যাটা তুমি গিয়েছিলে দাঁড়ি-পাল্লা হাতে করে চা ওজন করে মুদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে—বোঝো ঠ্যালা। অবশ্য সামনাসামনি বলেনি—বলেছিল আড়ালে।

তারপর আরম্ভ হল নবাব পরিবারের পতন। চা-বাগানের দেনা শোধ করবার জন্য নবাব সায়েব ঢুকলেন ফটকা বাজারে কলকাতার জুট আর বোম্বায়ের তুলো। ওদিকে নবাবের ভাগ্নে মারা যাওয়ার পর দেখা গেল বিরাট বিরাট জমিদারি সে কিনেছে বহু জায়গায় কিন্তু তার আপন নামে, নবাব সাহেবের নামে নয়। ভাগ্নের ছেলের সঙ্গে লাগলো মোকদ্দমা।

তখন আরম্ভ হল জমিদারি বন্ধক দেবার পালা। বিরহামপুরের লক্ষ্মণ পাল তার জন্য তৈরী হয়েছিল। আসতে লাগল কাঁড়া কাঁড়া টাকা এক দোর দিয়ে, বেরিয়ে গেল তিনদোর দিয়ে—ফটকা মোকদ্দমা আর কলকাতা-বিলাস। আগে নবাব সাহেবের একমাত্র শখ ছিল হরিণ শিকার। এখন যতই তাঁর টাকার অনটন বাড়তে লাগলো ততই চাপলো ফুর্তিবাজির নেশা। এদিকে নিজে মদ্য স্পর্শ করেন না, আবার শুনি

কলকাতায় নাকি ইয়ার-বক্সীদের এক সন্ধ্যায় দশ হাজার টাকার মদ খাইয়েছিলেন। 'শেম্পেন না কি যেন! কি জিনিস রে ওটা? তুই তো কলকাতায় অনেক কাল ছিলি।'

আমি বললুম, 'দামী ফরাসী মদ। তবে শুনেছি, দ্রব্যগুণও আছে। বেহুঁশকে হুঁশে আনতে হলে নাকি ওর বাড়া জিনিস নেই!'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'লাও! আমি তো শুনেছি মদ খেয়ে হুঁশিয়ার বেহুঁশ হয়।'

বিধু বৈষ্ণব। আদিরসের বেবাক বাৎ জানে। বললে, 'প্রেমের বেলাও তাই। প্রেমে পড়লে বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়, আর বোকা হয়ে যায় বুদ্ধিমান।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওসব থাক। নবাব-বাড়ির কথা বলো।'

'হ্যাঁ, নবাব-বাড়ির কথাই সব কথার নবাব। বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর একটা আন্তরিক মিল আছে। ওঁর রোক চাপাতে উনি এজমালি স্ত্রীটিকে পর্যন্ত খুইয়ে বসলেন। এঁর তাবৎ সম্পত্তি এঁরই এলাকার—যদিও পুষ্যে পুষ্যে মহলটি ভরতি—এবং আর কিছু না হোক মেয়েটার তো বিয়ে দিতে হবে। তবু সেই ক্ষয়-ক্ষতি, বিলাসব্যসন এবং সর্বগ্রাসী সর্বনাশ থেকে তখন তাঁকে বাঁচায় কে?'

আহমদ আলী বললে,

'এমন অনেক বন্ধু আছে দেয় রে তুলে আশা গাছে!
ভালোবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন আছে?'

বিধু বললে, 'একদম খাঁটি কথা। আমাদের যুধিষ্ঠিরের মৌলামুরুব্বী তো কাছোপিঠেই ছিলেন, আর ভীষ্ম তো সভাস্থলে বসেই। কিন্তু তাঁরাই কি ঠেকাতে পেরেছিলেন তখন তাঁকে?

ওদিকে তিনি হারলেন ভাগ্নের বেটার সঙ্গে মোকদ্দমায়। বিশ্বাস মামা অবশ্য এটা একদিন হতে পারে এই আশঙ্কায় কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিল, কিন্তু নবাব সাহেব মোকদ্দমা জিততে হলে যে এদিক ওদিক একটুখানি ইয়ে করতে হয়, অর্থাৎ মামার কাগজপত্র

মোতাবেক একটুখানি উনিশ-বিশ করতে হয়, তার সুবিধে নিতে রাজী হলেন না।

ঋণে ঋণে নবাব-বাড়ি যেন চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যেতে লাগলো। সে দুর্দৈবের কাহিনী আমি কি করে দু'ঘণ্টা, দুদিন বা দু'মাসে তোকে বলবো—যেটা ঘটেছিল ঝাড়া, পঁচিশ বৎসর ধরে, দিনে দিনে পলে পলে ?

যে নবাব-বাড়িতে একদিন এত ঘড়া ঘড়া কলসীভরা ঘি মৌজুদ থাকতো, যে গাঁয়ের থেকে আসা দাসী জলের বদলে ভুলে ঘি দিয়ে বদনা ভরে নিয়ে পিছন ফিরতে গিয়েছিল, সেখানে আরেক দিন আরম্ভ হল তেল, তারপর এমন দিনও এল যখন বাড়ির চতুর্দিকে জমে ওঠা বন থেকে লতা-পাঁতা কচু-ঘেঁচু যোগাড় করে সেদ্ধ করে খাওয়া। একদিন এই নবাব-বাড়িতে শীতের গোড়ায় যখন গণ্ডায় গণ্ডায় সাটিনের লেপ তৈরী হত তখন তুলোর উপর ঢালা হ'ত কণ্টর কণ্টর আতর—'

আমি বাধা দিয়ে শুধালুম, 'কণ্টর কি রে ?'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'দিশী ভাষা বেবাক ভুলে গিয়েছিস। কণ্টার মানে ডিকেণ্টার। চা-বাগিচার সায়েবরা প্রথম এদেশে আনে।'

বিধু বললে, শীতের রাতে শুতে শুতে সবাই শুঁকবেন সেই লেপের ভুরভুরে খুশবাই। শুধু সায়েব বিবিরা না—গোলাম, দয়লা, নওলা পর্যন্ত। সেখানেই শেষটায় ছালার চট নিয়ে শুধু কাঁথার কাজ না, কেউ কেউ নাকি লজ্জা নিবারণও করেছে।

একমাত্র সান্ত্বনার কথা, দুর্দশা চরমে পৌঁছবার পূর্বেই একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সেই শেষ ধার দিয়েছিল লক্ষ্মণ পাল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মামাও ঢেলে দিলেন—ঢেলে দিলেন বলা ভুল হয়, ছিটেফোঁটায় দিলেন তাঁর হিস্যের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তিনি যা যোগাড় করতে পেরেছিলেন। বেশীরভাগ আগেই গিয়েছিল নবাবের ছোট ছোট হাওলাত শোধ করে বড় বড় ঋণ আনতে !

পুষ্যিরা চতুর্দিকে ছিটকে পড়লো। সামান্য দু'চারজন যাদের অগতির

গতি বলেও কোনো গতি ছিল না, তারা ঠিক যেন বাস্তুসাপের মতই বন-বাদাড়ে ভরতি বাড়ির আনাচে-কানাচে কাটাতো দিনটা, রাতে বেরতো তাদের ব্যাঙ ইঁদুর অর্থাৎ লতা কচুর জন্য।

এমন সময়ে নবাবের মস্তকে বজ্রাঘাত। মেয়ে আসছে বাপের বাড়িতে। বিয়ের পর এই প্রথম। সে তো সব জানে তাঁর কী অবস্থা। সঙ্গে যে মেলা লোকজন আসবে। তিন পুরুষের ভিতর ব্যাটাছেলে মেয়েছেলের মধ্যে ও-ই তো সব চেয়ে বেশী মাত্রায় বুঝসমঝ নিয়ে জন্মেছিল। সে এ কি করতে চললো?

তার দিন তিনেক আগে তোদের মসজিদে মসজিদে শবীনা খতমের পরব হয়ে গিয়েছে। নবাব-বাড়ির পয়সায় ঐ যে পাশের টিলার মসজিদ, সেখানে নবাব সাহেবকে কিছু পাঠাতে হয়। তাঁর হাতে তাঁর আম্মাজান প্রথম মক্তব যাবার দিন বেঁধে দিয়েছিলেন একটি সোনার আশরফীর রক্ষাকবচ। কখনো সেটি হাত থেকে নাবেনি। সেইটি পাঠিয়ে দিলেন মসজিদে।

এই প্রথম নবাব সায়েব নিজে বেরলেন ধারের সন্ধানে। পায়ে হেঁটে।

লক্ষ্মণ পাল পিছনের দরজা দিয়ে পালালো।

মানুষ কি করে যে একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে-দিন সে আর চার আনা পয়সা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না সে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। ছেলেবেলায় মাইকেলের জীবনীতে পড়েছিলুম সেই নবাবের ছেলে মাইকেল—যিনি কিনা একদিন আস্ত সোনার মোহর দিয়ে সে যুগে চুল কাটাতেন—তিনি একদিন খয়রাতী হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে চার আনা পয়সা যোগাড় করতে পারেননি। তখন সেটা বিশ্বাস করিনি। আজ করি।'

"বিশ্বাস!"

"জী, হুজুর?"

"কি হবে?"

"কী আর হবে।"

সেই দিন সকালের গাড়িতে মেয়ের ষ্টেশনে পৌঁছাবার কথা। নবাব বিশ্বাস কেউই সেখানে যাননি।

সেই পায়রার ময়লায় ভরতি বৈঠকখানায় নবাব শুয়ে আছেন ভাঙা ইজিচেয়ারে। মামা সামনে বারান্দায় হেলান দিয়ে মাটিতে বসে।

'এমন সময় অতি নিঃশব্দে কে যেন ঘরে ঢুকলো।

'মেয়ে। সর্বাঙ্গে দামী গয়না। কিন্তু একা। রিকসায় করে এসেছে। কিন্তু একা।'

বিধু দেখি চুপ করে গিয়ে, নবাব-বাড়ির দিকে পিছন ফিরে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধালুম, 'একা মানে?'

বিধু বললে, 'আমাদের ডিস্ট্রিক্টের পয়লা ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন পাইক-বরকন্দাজদের নাকি নাববার হুকুম দিয়ে বলেছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাপের বাড়িতে যায় এ-রেওয়াজ নাকি তাদের পরিবারে নেই। মেয়ে যাবে ধুলো-পায়ে—একা।

সে রাতে মেয়ে বাজার থেকে হাঁড়িকুড়ি এনে বাপকে রেঁধে খাইয়েছিল। ধনীর মেয়ে বেহুলা-ধনী যে রকম নারকোলের খোলে রান্না করে লক্ষীন্দরকে দুপুর রাতে খেতে দিয়েছিল।'

॥ বিষের বিষ ॥

আগা আহ্‌মদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা—ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোর বেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে', ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ

দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই? আগা আহমদ দিন-মজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার।

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার নবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আজ কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকাল বেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোব্জ্রাবো, মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে।'

আগা আহমদ্ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলে এক মোকম ধাক্কা। তারপর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুকৃরিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউতো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয় নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমন্‌টাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাকগে, ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার। 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এতো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ দেখে—বাপরে বাপ, এ্যাব্বড় কালো-নাগ, কুলোপনা-চক্কর-গোখরো সাপ! সে তখনো চেঁচাচ্ছে 'বাঁচাও, বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'ত

তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অত ভয় কিসের ?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধ্যত্তর তোর প্রাণ ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে। আমাকে বাঁচাও এই তুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাটই না করছে, কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন ?'

চিল চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না ? সারাতো কোন ওঝা ? ওসব পাগলাম রাখো। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম !'

রূপকথা নয় সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও গুপ্তধনের গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজের পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে

আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম ?

সাপের দ্বারা ভালো কাম ?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেষছে না, বলছে উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল, এখন ফার্সী পড়ে আগা ? কী বা বেশ, কী বা ছিরি !

কোতয়ালের কানে, কিন্তু খবর গেল।

বন থেকে এসেছে ওঝা

পেটে এলেম বোঝা বোঝা !

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে

চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে ? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন সাপ ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্টা ?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার, বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল ! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কীতে তুলে দেওয়া হল !

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে—না ? তোমাকে না পইপই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ ? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ ঘোড়ার মসনব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর

আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট! চলো শিগ্গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ কাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখম দিয়ে গড়া থাকে না! ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়ালনন্দিনী, অন্যঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছো! তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন! বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি—তুমি আমার—'

'বাপরে, মারে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এরপর আগা আহম্মদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।'

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার 'ময়াল' কি, বলো তো।'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমনী যে কী কী খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'ময়াল' থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার একটা চিবোবার। দেখাবার 'ময়াল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'ময়াল'-টা গভীর :—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

॥ চাচা কাহিনী ॥

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রিটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডায় গোঁসাই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা—গোঁসাই, মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে

গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না। আজ বললেন 'অত ডরাচ্ছিস কেন?'

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, 'ওটা খাবার কী প্রয়োজন? আপনি তো কখনও খান নি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার?'

চাচা বললেন 'ওর বাপ খেত, ঠাকুর্দ্দা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায়, এ-দেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচী মাতাল নয়। আর, আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজীতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ। আসর জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। ওঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?' ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ক্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী,

রূপসিনী রঙ্গিনী,

নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, চোপ্—।'

চাচা বললেন 'ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদূখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোঁসাই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদূখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস! ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের সাঁঝের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।

আমি বললুম, অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ। রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু "ভদ্রস্থ" করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ মার্কা করব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পার, কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?

'ব্রাখেল বললেন, না হয় একটু বাঁদর-নাচাই দেখালে।'

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললেন, 'অজ পাড়াগাঁ ইষ্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য আমাদের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপন-ব্রেস্ট্ কোট পরা নয়, টিকিট বাবু, দুচারজন তামাশা-দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

'স্টেশনমাস্টার বললে, বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আসতে আজ্ঞা হোক।

'বুঝলুম, ফন ব্রাখেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার।

'বাইরে এসে দেখি এক প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং সুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, 'এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুঞ্জ্‌ রায়ের চোখের মত লাল 'জবাকুসুম-সঙ্কাশং।

'কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল, দাড়ি-গোঁফের ছাকনি দিয়ে যা বেরল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ" বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণভরে অভিসম্পাত করলুম এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

'আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হণ্টারওয়ালী ফিয়ারলেস্ নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্‌ দুইই তুলে নিয়েছে।

'মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাস্‌ল্‌। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ-দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়িভর্তা।

'আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, ওই আকাশে চড়তে হবে?

'কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, ইয়াঃ মাইন হের! দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁফের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন

পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, এক মিনিটে পৌঁছে যাব স্যার। আমি মনে মনে মৌলা আলিকে স্মরণ করলুম।

'এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাটুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বী চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টার ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক্, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে যেখানে দাঁড়াল তার উপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, 'ভিলিকিনি মানে?'

চাচা বললেন, 'ও, ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।

'তারপর আমাকে বললে, ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরি হয়ে নাও।'

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুন, আর গলাবন্ধ কোট কিন্তু একটা নেভি-ব্লু স্যুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্র-গুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এ কী? ডিনার জ্যাকেট পর নি?

'আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।

'ফন ব্রাখেল বললে, উঁহু, সেটি হচ্ছে না; এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার

উপায় নেই। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ড-ভর্তি ডিনার জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম ; ওই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।'

'আমি বললুম, তওবা ; তওবা ; তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পৌঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত ট্রেল করবে।

'বললে, না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমি চললুম।

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম, কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড্‌, দেরাজ-ভর্তি শার্ট, কলার, বো, হীরে-বসানো সোনার শ্লাভ-লিন্‌কস্‌, আরও কত কী!

'মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত।

'তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল এ বেশের সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার স্যাঙাৎ ভক্ত গোঁসাই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন সেইখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশী হয়ে বললেন, 'হেঁ-হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু ওই পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাকগে, ঈভনিং ড্রেসে কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিস দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার, আপনাকে তো কখনও শিস দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস দিতে পারেন?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস দিতে পারি কি না। তবে কী জানিস, হাফপ্যাণ্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছে করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিস দিতে যাব কেন? শিস কি দিয়েছিলুম আমি, শিস দিয়েছিল বকাটে স্যুটটা। তা সে কথা যাক।

'ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইং-রুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

'কাস্‌লের ব্যানকুয়েট হল্ আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে তার আর বিচিত্র কী, এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম, ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাত-ওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজী আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল্ দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন দি সেফ্‌সাইড।

'ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল্ কোন্ শতাব্দীর জানি নে কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিলে-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

'টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্য প্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

'প্রথম দর্শনে দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল; আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইণ্ডার

(ভারতীয়) দেখছেন, কালো ঈভনিং ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোঁসাইয়ের পদাবলীতে—

"কালোর উপরে কালো।"

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয় নি। কই আমি তো একদম রেডিমেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হ্যাল-ফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রী ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাশ চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল ?

'সামনে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, পাপা, এই হচ্ছে আমার ইণ্ডিশার আফে।

'অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

'বাপও ততক্ষণে সামনে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, প্‌ফুই—ছিঃ—ও রকম বলতে নেই।

'আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, 'আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।

'বলেই মনে হল, তওবা তওবা প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

'পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।

'পালিশ আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হাল্‌কা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দু দিকে সারি বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগি খেতে হয়, কোন্‌টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ্ ?

'আসল-খাবার পূর্বের চাট—"আর দ্য অভ্‌রে"র নাম দিয়েছি আমি

চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চায় ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধাল, শেরি ? পোর্ট ? ভের্মুট ? কিংবা উইস্কি সোডা ?

'আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। কিন্তু হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নো, বিয়ার।

'বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম। একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যান্‌কুয়েটে বিয়ার ! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা !

'ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

'বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

'যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁট ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।'

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল ? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা ? ও-রকম ঈভ্‌নিং ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট-হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপে বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম ? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস।'

গোঁসাই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা' !

চাচা বললেন 'অপরাধ নিসনি গোঁসাই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের

'আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে ! অবশ্য তখনও ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

'গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবশ্যি আমি করি নি ; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ লীড পায় না।

'রাত কটা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

'হের ফন ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, তোমার লাক বড় ভাল।

'অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, লাক, না কচুর ডিম। নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক ছাট্!

'ব্রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমি অষ্টমে উঠে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে আমি আরও চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, তোমার মুলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না। অথচ বেচারী বুড়ো থুথ্থুড়ে, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

'চীৎকার চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও সেই পরিপাটি ইভিনিং ড্রেস।

'আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম। তারপর বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্ফ্‌গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না ? আমার ঘুম হচ্ছে না।

'আমি বললুম, হুঁ হুঁ হুঁ!

'তাসের টেবিল এল।

'আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

'জ্যাঠা বললেন, কী স্টেক?

'বাপ বললেন, নিত্যিকার।

'"নিত্যিকার" বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, হানস্ পসেরো মার্ক ভল্ফ্গাঙ, তুই।

'আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়, এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

'এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম, এবার গেল আরো কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত আর আমার হিসাব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেন্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক জিতে গেলুম।

'ওদিকে মদ চলছে পাইকারী হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী নার্ভস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা

রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

'জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বললেন, হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন, হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—

'আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ! বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গড্ড্যাম লাকের দোহাই।

'টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যাণ্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম্—

'বাপ জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটু কাটব্য।

'এমন সময় দেখি, ক্লারা।

'কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, "ছোটলোক" "মীন", এই সব অশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

'ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।

'বেরবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, সরি, সরি প্লীজ, প্লীজ! আমাদের দোষ হয়েছে।'

'তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, ঢের ঢের মদ খেয়েছি ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এ-রকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনও শুনি নি।'

চাচা বললেন, যা বলেছ। তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম

শোবার ঘরে! ঈভনিং কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

'বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি। ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

'আর এদেশে সবাই ভাবে ইণ্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

'যতই ভাবতে লাগলাম মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালে বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানালা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

'তা হলে পালাই।

'অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে সুটকেসটি ওইখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইলখানেক এসে ফিরে তাকালুম; নাঃ কেউ পিছু নেয় নি।

'চোরের মত গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা?'

চাচা বললেন, 'আরে, শোনই না শেষ অবধি।'

'সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যাণ্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা-গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই রণের কিছু একটা।

'শেষটায় মর মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম!

'ক্লারা বললে, অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ও তো মাতলামো না,

পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

'তুমি যখন দাদার স্যুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তারপর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে "লেখাপড়ার সময় কোথায়? আমি তো করি হৈ-হৈ"—আমি জানতুম একদম বাজে কথা; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না।

'শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ।

'তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।

'কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; বাবা জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছুমাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস্ দিয়েছিল স্যুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

সমাপ্ত